কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী: একটি বিশে- ষণ

(The Historic Denotation Described in the Quran: A Reasoning)

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র
জানুয়ারি-২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

সাজেদা হোমায়রা
এম.ফিল. গবেষক
রেজি. নং-৫৫/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী: একটি বিশে-ষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণাকর্ম। এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ গবেষণাপত্র বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(সাজেদা হোমায়রা)
এম.ফিল. গবেষক
রেজি. নং-৫৫/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সাজেদা হোমায়রা কর্তৃক উপস্থাপিত "কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী: একটি বিশে- ষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোনো অংশ অন্যের ডিগ্রী থেকে নেয়া হয়নি অথবা অন্য কোনো প্রকাশনায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি। সুতরাং গবেষককে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

____

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ড় প্রশংসা মহান আল-াহ রাব্বুল ‘আলামীনের জন্য, যার অশেষ রহমতে পবিত্র কুর’আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী নিয়ে আমার গবেষণা ‘কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী: একটি বিশে-ষণ’টি শেষ করতে পেরেছি। সালাত ও সালাম শেষ নবী মানবতার মুক্তির মহান দূত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর মহান সাহাবাগণ, তাবি‘ঈনসহ মহান ব্যক্তিগণের প্রতি যারা তাঁদের জীবনকে গঠন করেছিলেন কুর’আনের আদর্শে। অতঃপর আমি আন্ড়রিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম ও মাতা সেহেলী শহীদের প্রতি যাদের দু'আ, উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমি এম.ফিল. গবেষণা কর্মটি শেষ করতে পেরেছি। আমি তাঁদের জন্য মহান আল-াহ রাব্বুল ‘আলামীনের দরবারে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্ড়ি ও কল্যাণ কামনা করি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন এর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল. গবেষণায় যোগদান করি এবং আল-াহ রাব্বুল ‘আলামীনের অশেষ রহমতে প্রথম পর্বের কোর্স সমাপ্ত করি। উক্ত কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় আন্ড়রিকতার সাথে আমাকে উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছেন। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় পুস্ড়ক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্ড়কের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেয়ার পথ প্রশস্ড় করেছেন। তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ড় পড়ে এর সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য মহান আল-াহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি। বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রতি সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমার এম.ফিল. গবেষণায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আল-আরাফা ব্যাংক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামি ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের বই থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি তাঁদের প্রতিও আমি অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

-গবেষক

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশন	
আ.	আলাইহিস সালাম
সা.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	রাদিয়াল্লাহু ‘আন্হু/ ‘আন্হুম/ ‘আন্হা/ ‘আন্হুমা/ ‘আন্হুন্না
রহ.	রাহ্ মাতুল্লাহি ‘আলাইহি
ড.	ডক্টর
পৃ.	পৃষ্ঠা
হি.	হিজ্রী
বি.দ্র.	বিশেষ দ্রষ্টব্য
ঢা.বি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
ইমাম বুখারী	আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা’ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী
ইমাম তির্মিযী	আবূ ‘ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ‘ঈসা আত-তির্মিযী
ইমাম আবূ দাঊদ	আবূ দাঊদ সুলাইমান ইব্ন আশআস্ আস-সিজিস্ড়নী
ইমাম নাসাঈ	আহ্মদ ইব্ন শু‘আইব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহ্মাদ	আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল
ইব্ন কাসির	আবূল ফিদা ‘ইমাদুদ্দীন ইসমা‘ঈল ইব্ন কাসির
ইব্ন জারীর	আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী
ই. ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়হাকী	আহ্মাদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	০১
১ম অধ্যায়	**কুরআন ও ইতিহাস**	**০৪**
১ম পরিচ্ছেদ	ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে কুর'আনের মর্যাদা	০৪
২য় পরিচ্ছেদ	আল কুর'আনে বর্ণিত ইতিহাস সূত্র ও মানব রচিত ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য	০৫
২য় অধ্যায়	**আল কুর'আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী**	**০৭**
১ম পরিচ্ছেদ	আল কুর'আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর গুরুত্ব	০৭
২য় পরিচ্ছেদ	কুর'আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর শ্রেণিবিভাগ	১০
৩য় অধ্যায়	**আল কুর'আনে বর্ণিত আল-াহর অনুগ্রহের স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শন**	**১২**
১ম পরিচ্ছেদ	এক অপূর্ব ঐতিহাসিক নিদর্শন: কা'বা শরীফ	১৩
	কা'বা নির্মাণের ইতিহাস	১৩
	কা'বা শরীফের বিভিন্ন নাম	১৬
	কা'বা শরীফের আকৃতি	১৬
	হাজারে আসওয়াদ	২০
	মাকামে ইবরাহীম	২৩
	কা'বা শরীফের মর্যাদা	২৭
২য় পরিচ্ছেদ	স্মৃতি বিজড়িত পাহাড়: সাফা ও মারওয়া	২৯
৩য় পরিচ্ছেদ	রহস্যে ঘেরা যমযম কূপ	৩৪
	যমযম কূপের ইতিহাস	৩৪
	যমযম পানির ফযীলত	৩৬
	যমমঘ পানির বৈশিষ্ট্য	৩৭
	যমযম কূপ নিয়ে ডা: মাশারো ইমাটোর গবেষণা	৩৮
	বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে যমযম কূপের রহস্য	৪০
৪র্থ পরিচ্ছেদ	ঐতিহাসিক বায়তুল মুকাদ্দাস: এক অনুপম নিদর্শন	৪১
৪র্থ অধ্যায়	**ধ্বংসাবশেষের ঐতিহাসিক নিদর্শন**	**৪৬**
১ম পরিচ্ছেদ	নূহের নৌযান: একটি জ্বলন্ড় নিদর্শন	৪৮
	নূহ (আ.) এর পরিচয়	৪৮
	নূহ (আ.) এর জাতির পরিচয়	৫০
	হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির নৈতিক অধঃপতন	৫০
	হযরত নূহ (আ.) এর দা'ওয়াত	৫২
	নৌযান নির্মাণ	৫৮
	নূহ (আ.)-এর পুত্রের পরিণতি	৬০
	মহাপ-াবনে নূহ (আ.)-এর জাতির পরিণতি	৬০

	মহাপ-াবনে ঈমানদারদের অবস্থা	৬৩
	মহাপ-াবন কি বিশ্ব জুড়ে ছিলো	৬৪
	শেষে হলো মহাপ-াবন	৬৫
	নূহ (আ.) এর নৌযান থামার স্থান	৬৭
	নূহ (আ.) এর নৌযান: মানব জাতির জন্যে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন	৬৭
২য় পরিচ্ছেদ	নির্মম ধ্বংসের কবলে ক্ষমতাধর আদ জাতি	৭১
	আল কুর'আনে আদ জাতির উলে-খ	৭১
	আদ জাতির যুগ	৭২
	আদ জাতির আবাসস্থল	৭২
	আদ জাতির আবাসস্থলের বর্তমান অবস্থা	৭৪
	আদ জাতির ধর্ম	৭৫
	আদ জাতির প্রতি প্রেরিত নবী হযরত হুদ (আ.)	৭৫
	হযরত হুদ (আ.) এর দা'ওয়াত	৭৬
	আদ জাতির ধ্বংসের পূর্বের সচ্ছলতা	৭৯
	আল কুর'আনে তাদের সমৃদ্ধি ও গর্ব অহংকারের উলে-খ	৭৯
	যেসব কারণে ধ্বংস হয় আদ জাতি	৮১
	আল কুর'আনের বর্ণনায় আদ জাতির আযাব	৮২
	বেঁচে গেলেন সত্যানুসারীরা	৮৫
	আল কুর'আনে বর্ণিত আদ জাতির অস্ড়িত্বের প্রমাণ	৮৬
	আদ জাতির আযাব: পরবর্তীদের জন্যে একটি দৃষ্টান্ড়	৮৯
৩য় পরিচ্ছেদ	সামুদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী: মাদায়েনে সালেহ	৯০
	সামুদ জাতির পরিচয়	৯০
	সামুদ জাতির বাসস্থান	৯০
	সামুদ জাতির নৈতিক অধ:পতন	৯০
	সামুদ জাতির প্রতি সালেহ (আ.) এর দা'ওয়াত ও তাদের প্রত্যাখ্যান	৯৩
	মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি ও সিদ্ধান্ড়কর নিদর্শন	৯৪
	হযরত সালেহ (আ.)-এর বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিকারীদের ষড়যন্ত্র ও আল-াহর প্রেরিত আযাব	৯৬
	রক্ষা পেলো ঈমানদারগণ	৯৯
	মাদায়েনে সালেহে সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ	৯৯
৪র্থ পরিচ্ছেদ	বিকৃত পাপে অভিশপ্ত লূত জাতি ও ঐতিহাসিক মৃতসাগর (DEAD SEA)	১০৬
	হযরত লূত (আ.) এর পরিচয়	১০৬
	লূত জাতির এলাকা ও মৃত সাগর	১০৭
	লূত জাতির নৈতিক অধঃপতন	১০৮
	সমকামিতা: লূত জাতির এক জঘন্যতম অপরাধ	১১০
	বর্তমানযুগে সমকামিতার বৈধতা	১১১
	হযরত লূত (আ.) এর দা'ওয়াত ও এর প্রতিক্রিয়া	১১২

	ফেরেশতাদের আগমণ ও লূত (আ.) এর দুশ্চিন্ড়া	১১৩
	নবীর দূর্ভাগা স্ত্রী	১১৪
	লূত জাতির ওপর আযাব অবতরণ	১১৫
	মৃত সাগরে লূত জাতির আযাবের নিদর্শন	১১৫
	মৃত সাগর ও আমাদের শিক্ষা	১১৯
৫ম পরিচ্ছেদ	অভিশপ্ত ফেরাউনের লাশ: ইতিহাসের এক জ্বলন্ড় নিদর্শন	১২২
	ফেরাউনের পরিচয়	১২২
	ফেরাউনের অপরাধসমূহ	১২৩
	ফেরাউনের প্রতি মূসা (আ.) -এর দা'ওয়াত ও ফেরাউনের ধূর্তামী	১২৪
	দূর্ধর্ষ ফেরাউনের ভয়াবহ পরিণাম	১২৬
	ফেরাউনের রক্ষিত লাশ: আল কুর'আনের অলৌকিক নিদর্শন	১২৯
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ	মহান আল- াহর নিয়ামত অস্বীকারকারী কাওমে তুব্বার পরিণতি	১৩৪
	সাবা জাতির পরিচয়	১৩৪
	সাবা জাতির অন্ড়র্গত কাওমে তুব্বার পরিচয়	১৩৭
	সাবা জাতির উত্থান	১৩৭
	কাওমে তুব্বার ধ্বংস	১৩৯
৭ম পরিচ্ছেদ	ঐতিহাসিক আসহাবে কাহ্ফ	১৪১
	আসহাবে কাহ্ফ -এর বিস্ময়কর ঘটনা	১৪৪
	আসহাবে কাহ্ফ -এর সংখ্যা	১৫১
	গুহাবাসীদের গুহায় অবস্থানের মেয়াদ	১৫৩
	আসহাবে কাহ্ফের সমাধি সৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ড় ও আল াহর ক্ষোভ	১৫৪
	আসহাবে কাহ্ফ এর ঘটনা: একটি শিক্ষনীয় নিদর্শন	১৫৬
৮ম পরিচ্ছেদ	আল- াহর অবাধ্য লোভী কারূনের কর"ণ পরিণতি	১৫৭
	কারূনের পরিচয়	১৫৭
	কারূনের ধন-সম্পদ	১৫৭
	ধ্বংস হলো কারূন	১৫৯
৯ম পরিচ্ছেদ	আসহাবে ফীলের ঘটনা: মহান আল- াহর অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন	১৬১
	আসহাবে ফীলের ঘটনার ঐতিহাসিক পটভূমি	১৬২
	আসহাবে ফীলের ঘটনা	১৬৭
	মহান আল- াহর অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন	১৭২
১০ম পরিচ্ছেদ	আহলে মাদইয়ান ও আসহাবে আয়কাহ	১৭৫
	ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান	১৭৫
	উভয় গোত্রের জন্যে একই নবী কেন?	১৭৬
	মাদইয়ানবাসীদের পরিচয়	১৭৭
	সংস্কার সংশোধনের আহ্বানের প্রতিক্রিয়া	১৭৮
	মাদইয়ানবাসীদের উপর আযাব	১৭৯

	আয়কাবাসীদের উপর আযাব	১৮০
	উপসংহার	১৮১
	গ্রন্থপঞ্জী	১৮৪

ভূমিকা

সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোনো সৃষ্টিই সম্ভব নয়। পরম পরাক্রমশালী আল-াহ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও অধিশ্বর। মহান আল-াহ পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেছেন:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ •

"তিনিই মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী। তিনি যখন কোনো কিছু সূচনা করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু সেটার উদ্দেশ্যে বলেন: 'হও', আর সংগে সংগে তা হয়ে যায়।" (আল কুর'আন, ২:১১৭)

সমস্ড় প্রশংসা একমাত্র সেই আল-াহ রাব্বুল আ'লামীনের এবং তিনিই তা লাভের যোগ্য। মহান আল-াহ এ মহাবিশ্বকে সুন্দর ও সুবিন্যস্ড়ভাবে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী ও আকাশ এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক তিনিই। আল-াহর এ সৃষ্টিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বোঝার জন্যে তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন পবিত্র গ্রন্থ আল কুর'আন। তবে তাঁর সকল কার্যক্রম, সৃষ্টি কেবলমাত্র বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে, যাদের জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, চিন্ড়া করতে পারে কেবল তারাই আল-াহ তা'য়ালার সৃষ্টি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে। জ্ঞানহীন ও মূর্খরা তা কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। জ্ঞানী ও বোধসম্পন্নগণ আল-াহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বুঝতে পারেন।

মহাবিশ্বের চির বিস্ময় আল কুর'আন আল-াহর কালাম। আখেরাতের জীবনে পরিপূর্ণ মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করার সুনিশ্চিত পথ নির্দেশই আল কুর'আন। কুর'আনের শিক্ষা থেকে সঠিক পথ নির্দেশ লাভ করতে হলে এ কিতাবের প্রতিটি কথা বুঝতে হবে, অনুভূতির তীব্রতা দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। কেননা, কুর'আন কিয়ামত পর্যন্ড় সকল শ্রেণির মানুষের জন্যে জীবন সমস্যার সব বিষয়েই পরিপূর্ণ সমাধান দিতে সক্ষম। কুর'আন অবতীর্ণ হবার যুগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর চলমান যুগ পর্যন্ড় মহাগ্রন্থ আল কুর'আন নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে যে গবেষণা ও বিশে-ষণ হয়েছে, এ পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নিয়ে এর শতভাগের একভাগও গবেষণা হয়নি। কুর'আন নিয়ে গবেষণার সমাপ্তি নেই এবং পৃথিবী ও মানব সভ্যতার অস্ড়িত্ব থাকা পর্যন্ড় এর গবেষণা চলতেই থাকবে ইনশাআল-াহ। আর মানুষ লাভ করতে থাকবে নিত্য নতুন তথ্য ও তত্ত্ব।

আল□াহ সুবহানাহু তা'য়ালা একজন অসীম সত্তা যিনি অগণিত গুণাবলির অসীম অনন্ড় আধার। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অগণিত নিদর্শন। এসব নিদর্শন আসলে মহান আল□াহর ক্ষমতা যা তাঁর মহান সত্তার সাথে সংযুক্ত। আল-াহর সত্তাও যেমন অসীম তেমনি তাঁর ক্ষমতাও অসীম। মহান আল-াহ তা'য়ালা তাঁর অস্ড়িত্ব, সবকিছু যে তাঁরই সৃষ্টি এবং সমগ্র সৃষ্টি যে তাঁরই নিয়ন্ত্রণে চলে এসব মানবজাতিকে বোঝানোর জন্যে পৃথিবীতে অসংখ্য নিদর্শন পেশ করেছেন। তার মধ্যে কিছু রয়েছে ঐতিহাসিক নিদর্শন। এসব ঐতিহাসিক নিদর্শগুলোর বর্ণনা মহান আল-াহ পবিত্র কুর'আনেও তুলে ধরেছেন। এসব নিদর্শনের মাধ্যমে আল-াহকে চেনা যায় ও জানা যায় তাঁর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে।

আল-াহর জমিনে বিরজীত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর গুরুত্ব মুসলিম জাতির জন্যে অতুলনীয়। মানুষের পক্ষে আল-াহকে দেখা সম্ভব নয় কিন্তু পৃথিবীতে বিরাজমান এসব ঐতিহাসিক নিদর্শনের মাধ্যমে মহান আল-াহর অস্ড়িত্ব, জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

কুর'আনে বর্ণিত প্রত্যেকটি ঘটনা ও ঐতিহাসিক নিদর্শন শুধুমাত্র গল্প শোনানোর জন্যে উলে-খ করা হয়নি। বরং এ সবের শিক্ষা আমাদের বাস্ড়ব জীবনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উপকরণ। দুনিয়ায় বিরাজমান রয়েছে আল-াহর অনুগ্রহের স্মৃতি বিজড়িত বহু নিদর্শন। এসব নিদর্শনগুলো মহান আল-াহর সাথে তাঁর বান্দাদের সম্পর্ককে গভীর করে তুলতে সাহায্য করে। আরো রয়েছে অতীতের বিভিন্ন জাতিদের ধ্বংসাবশেষের ঐতিহাসিক নিদর্শন। অতীতে যারা তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতকে অস্বীকার করেছিলো, অবশেষে তাদের পরিণাম হয়েছিলো ভয়াবহ। বিরাজমান এসব ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো শুধু দেখার জন্যেই নয় বরং সতর্ক হওয়ার ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। পবিত্র কুর'আনে ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বলিত অনেক আয়াত আছে যাতে লুকিয়ে রয়েছে কোনো উপদেশ বা কোনো শিক্ষা। আল কুর'আনে বর্নিত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে আল-াহ তা'য়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হতে পারে এবং মানুষ উপলব্ধি করতে পারে আল-াহর সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে। যা তাকে সহায়তা করে সঠিক ও ন্যায় পথে চলতে এবং অন্যায় ও অসত্য পথ থেকে দূরে থাকতে।

পৃথিবী ও আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে আল-াহ তা'য়ালার অগণিত নিদর্শন, যেগুলো সর্বত্র, সর্বক্ষণ আল-াহর একক সার্বভৌম কর্তৃত্বের ঘোষণা দিচ্ছে। বিভ্রান্ড় মানুষেরা আল-াহর সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অধিকার প্রতিনিয়তই অন্যদেরকে কোনো না কোনো ভাবে অংশীদার করছে। কিন্তু তারা যদি পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা

আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতো, তাহলে তাদের মধ্যে কোনোদিন এ বিভ্রান্তির জন্ম হতো না।

তাই আল কুর'আনে বর্ণিত এবং দুনিয়ার বিদ্যমান এসব ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো মানুষ দেখবে, জানবে, উপলব্ধি করবে এবং এ থেকে শিক্ষা নেবে। এসব নিদর্শগুলোর শিক্ষা তারা তাদের চলার পথে পাথেয় হিসেবে কাজে লাগাবে।

এ গবেষণা কর্মটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ১ম অধ্যায়ে ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে কুর'আনের মর্যাদা এবং আল কুর'আনের ইতিহাস ও মানব রচিত ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২য় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আল কুর'আনের বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর গুরুত্ব ও শ্রেণিবিভাগ।

৩য় অধ্যায়ে আল কুর'আনে বর্ণিত আল্লাহর অনুগ্রহের স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কা'বা শরীফ, স্মৃতি বিজড়িত পাহাড় সাফা ও মারওয়া, যমযম কূপ ও ঐতিহাসিক বায়তুল মুকাদ্দাস।

৪র্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো- নূহ (আ.)-এর নৌযান, নির্মম ধ্বংসের কবলে আদ জাতি, সামুদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী, অভিশপ্ত লূত জাতি ও ঐতিহাসিক মরুসাগর, ফেরাউনের লাশ, কাওমে তুব্বা, আসহাবে কাহ্‌ফ, কারুনের করুণ পরিণতি, আসহাবে ফীল এবং আহলে মাদইয়ান ও আসহাবে আয়কাহ।

আলোচ্য থিসিস বা গবেষণা কমিটিতে ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর প্রেক্ষাপট, উৎপত্তি, কার্যকরণ, মানবজাতির জন্যে নির্দেশনা এবং কল্যাণ লাভের উপায় নিয়েই বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে। এ বিষয়টি বর্তমান ধ্বংসন্মুখ বিশ্ব মানবতা এবং বহু দল, উপদলে বিভক্ত মুসলিম উম্মাহর জন্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১ম অধ্যায়

কুরআন ও ইতিহাস

১ম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে কুর'আনের মর্যাদা

আল কুর'আন হলো বিস্ময়কর এক গ্রন্থ। এ কথা শুধু মুসলিমগণই বলেন না বরং যাদের কাছে এ গ্রন্থটি অতি মূল্যবান এবং যারা এটি নিয়ে সন্তুষ্ট সে সমস্ড় অমুসলিমদের দ্বারাও এটি বিস্ময়কর বলে চিহ্নিত হয়েছে। কুর'আনের এ বিস্ময়কর ক্ষমতা যুগে যুগে মানুষকে এ মহাগ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট করে আসছে।

এটি হলো এক প্রচার যা মানুষকে জানানো হয়েছিলো ঐশী বাণী বা ওহীর প্রক্রিয়ায়। এটি অবতীর্ণ হবার ধারা তেইশ বছর ধরে চলেছিলো। এটা হিজরতের আগে ও পরে সমান সময়কাল- ব্যাপী ঘটেছিলো। এটি নির্দিষ্ট স্থান বা কালের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়নি। সর্বযুগের জন্যেই এর প্রযোজ্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

আল কুর'আন সুপথ বা হিদায়াত লাভের ঐশী মহান গ্রন্থ। এ কিতাব সবসময়ই মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে ও জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় থেকে শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানায়।

কুর'আনের বর্ণনায় বিশ্ব জগতের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে মহান আল-াহর সৃষ্টি-কৌশল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈপুণ্যের নানা নিদর্শন। এ মহাগ্রন্থ সৃষ্টি জগত নিয়ে চিন্ড়া ভাবনা ও গবেষণার আহ্বান জানায়।

কুর'আন অনেক ঐতিহাসিক (অজানা) বিষয় মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। আধুনিক যুগের ইতিহাস গবেষকদের তথ্যের সাথে বহুযুগ আগে কুর'আনের তুলে ধরা ঐতিহাসিক তথ্যগুলোর মিল মানুষকে বিস্মিত করেছে। কুর'আনের এ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সর্বযুগেই সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেন:

"আমার আশা হয় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ড় দেশের শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ=লীকে সম্মিলিত করে কুর'আনের মতবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করে জগতে একতামূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো। কারণ একমাত্র কুর'আনই সত্য এবং তা মানব জাতিকে সুখ ও শান্ড়ির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।"[১]

---

০১. আল-ামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা, ইতিহাসের ইতিহাস (ঢাকা: মুনশী মোহাম্মদ মেহের=ল-াহ রিসার্চ একাডেমী, প্রকাশকাল- ফেব্র=য়ারী-২০০৭), পৃ.-১৯

২য় পরিচ্ছেদ

আল কুর'আনে বর্ণিত ইতিহাস সূত্র ও মানব রচিত ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য

ইতিহাস আমাদের যাত্রা পথের পাথেয় প্রদানে দৃষ্টান্তবিহীন এক সামগ্রী সম্ভার। ইতিহাসের নাম বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নরূপ। যেমন বাংলায় 'ইতিহাস', ইংরেজীতে 'History', আরবিতে 'তা-রিখ', উর্দূতে 'তা-রিখ', হিন্দিতে 'ইতিহাস' প্রভৃতি।[২]

ইতিহাস মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীতে মানুষের আগমণ থেকে শুরু করে কতো জনপদ গড়ে উঠেছে এবং কতো জনপদ কালের চক্রাকারে হারিয়ে গিয়েছে। ইতিহাস তা আমাদের জানতে সাহায্য করে। ইতিহাসের মাধ্যমেই মানুষ পূর্বের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

আল কুর'আন মানব জাতির সামনে যে ইতিহাস তুলে ধরেছে তা কোনো আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে রচিত হয়নি। যে ইতিহাস এ কুর'আন পেশ করেছে সে ইতিহাস যে যুগের বা যে অঞ্চলেরই হোক না কেন এ ব্যাপারে কুর'আনের বক্তব্যই চূড়ান্ত সত্য। কারণ এ কুর'আনিক ইতিহাসের সরবরাহকারী হলেন মহাজ্ঞানী ও চিরঞ্জীব সত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

আল কুর'আনে মানুষের ইতিহাস সম্বলিত ধারাবাহিক কোনো কাহিনী বর্ণিত হয়নি। ইতিহাস থেকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমুখী শিক্ষামূলক ঘটনাগুলো নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কুর'আন ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছে তা বহু ব্যাপক ও গভীর এবং মানুষের বাস্তব জীবন ভিত্তিক। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় কুর'আন বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের সামগ্রিক কার্যাবলী ও চরিত্রকে শামিল করেছে। পক্ষান্তরে ক্যান্ট, হারডার, হেগেল, স্পেঞ্জলার, কার্লমার্কস, বার্টান্ড রাসেল, আর্নল্ড টয়েনবি প্রমুখ ইতিহাসবেত্তারা কেবল মানুষের কার্যাবলীকে ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাস মানুষের সামগ্রিক কার্যাবলীর ফলশ্রুতি বৈ আর কিছুই নয়। মানুষ এত জটিল জীব যে, একটা সরল সমীকরণ দ্বারা মানুষের কার্যাবলী তথা ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণতা ও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তদুপরি তারা মানুষকে মহাজাগতিক বিবর্তনের ঘটনা প্রবাহ এ পৃথিবীকে এবং এ পৃথিবীর সবকিছুকে সবসময় প্রভাবিত করছে। কাজেই মানুষের ঐতিহাসিক মহাজাগতিক বিবর্তনের ঘটনা প্রবাহ থেকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা একটা বিরাট গলদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি।[৩]

ইতিহাসের ব্যাখ্যায় কুর'আনের বাণীর সারমর্ম হলো এই যে, গোটা সৃষ্টি জগতে ও ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে সৃষ্টির তিনটি বুনিয়াদী নীতি রবুবিয়াত, রহমানিয়াত ও হক (ন্যায়পরায়ণতা, সততা, ইনসাফ ও আদালত) কার্যকরী রয়েছে। রহমানিয়াতের আজাল

---

০২. প্রাগুক্ত, পৃ.-০৯

০৩. আলহাজ্ব অধ্যাপক গোলাম ছোবহান, *কুর'আন মজীদের উৎকর্ষের কিছু দিক* (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৯৭), পৃ.-২৮৯

(অবকাশ দান নীতি) অনুসারে ইতিহাসের ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়া সমূহের ফল খুব ধীরে প্রকাশ পেলেও সত্যের জয় ও মিথ্যার বিলুপ্তি এবং হিতকরের প্রতিষ্ঠা লাভ নীতিই ইতিহাসের গতিধারার নিয়ামক।[৪]

আল কুর'আন ইতিহাস থেকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমুখী শিক্ষামূলক ঘটনাগুলো উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছে। গোটা মানবজাতির জন্যে সেগুলোতে রয়েছে উপদেশের ভান্ডার এবং কুর'আন সেগুলো বারবার মানুষের কাছে পেশ করেছে।[৫]

এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট কুর'আনে বর্ণিত ইতিহাস ও মানব রচিত ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। মানব রচিত ইতিহাস কখনোই কুর'আনে বর্ণিত ইতিহাসের সমতুল্য হতে পারে না। মূলত দুটি কারণে মানব রচিত ইতিহাসকে কুর'আনে বর্ণিত ইতিহাসের সাথে তুলনা করা যায় না।

এক. মানব রচিত ইতিহাসের জন্ম হয়েছে অতি সাম্প্রতিককালে। অথচ ইতিপূর্বে সংঘটিত মানব ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনা অজানার অন্তরালেই রয়ে গেছে। আল কুর'আন সে সকল হারানো দিনের অনেক তথ্যই পেশ করেছে। অথচ তথাকথিত ইতিহাসের পক্ষে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয়া অত্যন্ত কঠিন।

দুই. অতীতের ঘটনাবলীর মধ্যে থেকে কোনো কিছু যদি ইতিহাসে পাওয়া যায়ও তো তার কোনো গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। কারণ সেগুলো হচ্ছে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন ও অপ্রতুল জ্ঞানের অধিকারী মানুষদের তৈরি করা ইতিহাস। তাছাড়া এসব ইতিহাস গ্রন্থাবলী পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও অতিরঞ্জনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মোটেও মুক্ত নয়।

অন্যদিকে, পবিত্র কুর'আন যেসব ইতিহাস পেশ করেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা এ কুর'আন এসেছে অদ্বিতীয় ও চিরঞ্জীব এক সত্তার কাছ থেকে যিনি চিরকাল ছিলেন, চিরকাল থাকবেন। গোটা পৃথিবী ও সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। সুতরাং পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে কুর'আনের তথ্যই একমাত্র নির্ভুল ও চূড়ান্ত।

তাই মানব রচিত ইতিহাসের তথ্যের মানদণ্ডে কুর'আনকে যাচাই করা যায় না। বরং কুর'আনের তথ্যের ভিত্তিকে ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করা যায়। কুর'আনের একটি অক্ষরের সাথেও যদি মানব রচিত ইতিহাসে কোনো সংঘর্ষ দেখা যায় তাহলে সে ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কুর'আনকে গ্রহণ করাটাই হবে যুক্তিযুক্ত।

---

০৪. প্রাগুক্ত

০৫. প্রাগুক্ত

২য় অধ্যায়

আল কুর'আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী

১ম পরিচ্ছেদ

আল কুর'আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর গুরুত্ব

নিদর্শনকে আরবিতে বলা হয় 'শি'আর'। এ শব্দটি শাঈরাতুন বা শি'আরাতুন এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হলো আলামত, চিহ্ন বা নিদর্শন।

যে জিনিসটি কোনো আকিদা-বিশ্বাস, মতবাদ, চিন্তাধারা, কর্মনীতি বা কোনো ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তাকে তার শি'আর বলা হয়। আল্লাহর নিদর্শনগুলো যেখানেই দেখা যাবে প্রত্যেক মুসলিমকে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেছেন:

- ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

"এগুলো (আল্লাহ্র নির্দেশাবলি), আর যারাই আল্লাহ্র নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান দেখাবে, সেটা হবে অন্তরের তাকওয়ার প্রকাশ।"[৬]

অর্থাৎ এ সম্মান প্রদর্শন মানুষের হৃদয় অভ্যন্তরের তাকওয়ার ফল এবং মানুষের মনে যে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় আছে তা এরি চিহ্ন। যে আল্লাহকে ভয় করে, সেই আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শনসমূহের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অমর্যাদা করে, সে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে তার মনে আল্লাহর ভয় নেই। অথবা সে আল্লাহকে স্বীকারই করে না।

মহান আল্লাহ বলেন:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্যের ও ভক্তির নিদর্শনগুলোর অমর্যাদা করো না।"[৭]

আল্লাহর নিদর্শনগুলোর প্রতি মর্যাদা দেখানো মানে হলো শিরক, কুফরি ও নাস্তিক্যবাদের পরিবর্তে নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের মধ্যে কোনো প্রকার মুশরিকী ও কুফরি চিন্তার মিশ্রণ থাকবে না।

---

০৬. আল কুর'আন, ২২:৩২

০৭. আল কুর'আন, ০৫:০২

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ •

"দিনরাত তারা আসমান জমিনের কতো যে নিদর্শন অতিক্রম করছে, অথচ সেগুলোর ব্যাপারে তারা একেবারেই উদাসীন (সেগুলো সম্পর্কে মোটেও তারা ভেবে দেখে না।)"[৮]

এখানে মহান রাব্বুল আলামিন মানুষকে তাদের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি জিনিস নিছক একটি জিনিসই শুধু নয় বরং সত্যের প্রতি ইংগিতকারী একটি নিদর্শনও। যারা এ জিনিসগুলোকে শুধুমাত্র একটি জিনিস হিসেবে দেখে তারা কখনো বিবেকবান মানুষ হতে পারে না। মানুষকে মহান আল-াহ ইন্দ্রিয়ানুভূতি সহকারে চিন্ড়া ভাবনা করার জন্যে মস্তিষ্ক দান করেছেন কারণ মানুষ আকাশ ও পৃথিবীর সব জিনিস দেখবে এবং এর সত্য অনুসন্ধান করবে। আর এ নিদর্শগুলোর মাধ্যমেই মানুষ আল-াহর ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। কিন্তু মানুষ যদি এ নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্ড়া-ভাবনা না করে গাফলতির মধ্যে ডুবে থাকে তাহলে তারা মূলত গোমরাহীতেই নিক্ষিপ্ত হবে।

শাহ ওয়ালিউল-াহ দেহলভী (র.) বলেন:
নিদর্শনসমূহ স্বভাবজাত প্রক্রিয়াতেই নিদর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ কোনো নিয়ম বা আচরণের ওপর মানুষের অন্ড়র আস্থা অনুভব করে এবং এটি এমন প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হয়ে যায় যে তা দেখা মাত্রই অনুধাবনযোগ্য বিষয়ের অন্ড়র্ভুক্ত মনে করা হয়। আর তখনই এটি নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে।[৯]

মূলত নিদর্শন হলো এমন প্রকাশ্য উপলব্ধিকৃত বস্তুসমূহ যার কারণে আল-াহর ইবাদত করা হয় এবং এ সম্মান মানুষের অন্ড়রে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে শত সমস্যায়ও এটি বিদ্যমান থাকে। এ অবস্থা এমন হয়ে যায় যেমন আল-াহর নামে শপথকারী শপথ ভংগ করতে অন্ড়রে দ্বিধাবোধ করে।

মুশরিক ও কাফেরদেরকে আল-াহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখনই তাদের কাছে আল-াহর কোনো আয়াত আসে অর্থাৎ কোনো মু'জিযা বা আল-াহ তা'য়ালার একত্বের ওপর কোনো স্পষ্ট দলিল বা রাসূল (সা.) এর সত্যতার কোনো নিদর্শন এসে পড়ে তখন

০৮. আল কুর'আন, ১২:১০৫
০৯. হযরত শাহ ওয়ালী উল-াহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র.), *হুজ্জাতুল-াহিল বালেগা*, অনুবাদ: আহমদ মানযুরুল মাওলা (ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশান্স, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৭৮), খন্ড-০১, পৃ.-১৮৪

তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওটাকে মোটেই গ্রাহ্য করে না। মহান আল্লাহ বলেছেন এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আল-াহ তা'য়ালা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যারা তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলো এবং শাসন ক্ষমতাও লাভ করেছিলো, এমনকি সংখ্যার দিক দিয়েও যারা অধিক ছিলো তাদেরকেও তিনি শাস্তি থেকে রেহাই দেননি। এটা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে ঐরূপ শাস্তি তাদের ওপরও এসে যেতে পারে।[১০]

আর এসব নিদর্শন দেখেই মানুষের অন্তর ও তাদের চিরাচরিত জ্ঞান মহান আল-াহ তা'য়ালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া আবশ্যিক মনে করে। তখনই মানুষ ঐতিহাসিক এসব নিদর্শনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

---

১০. হাফিয ইমাদুদ্দিন ইবন্ কাসীর (র.) *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, অনুবাদ: ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশনস কমিটি, ডিসেম্বর-২০০৯), খন্ড-০৩, পৃ.-১৩

২য় পরিচ্ছেদ

কুর’আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর শ্রেণিবিভাগ

গোটা মহাবিশ্বে রয়েছে মহান আল-াহর অগনিত নিদর্শন। এর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক নিদর্শন এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন।

কুর’আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শগুলো মূলত দুই প্রকার:

এক. আল-াহর অনুগ্রহের স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শন।

দুই. ধ্বংসাবশেষের ঐতিহাসিক নিদর্শন।

মহান আল-াহ তাঁর অস্ড়িত্ব, সবকিছু যে তাঁরই সৃষ্টি এবং সমস্ড় সৃষ্টি যে তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে, এসব মানব ম-লীকে বোঝানোর জন্যে অসংখ্য নিদর্শন পেশ করেছেন। এসবের মাধ্যমে তাঁকে জানা ও চেনা যায়। আল-াহর নিদর্শন সমূহের কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নেই। সৃষ্টির প্রথম হতে অদ্যাবধি এবং শেষ পর্যন্ড় তাঁর অসীম নিদর্শনাবলী চিরস্থায়ী। মহান আল-াহ বলেন:

قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ •

“নিশ্চয় যেসব লোক জ্ঞান রাখে তাদের জন্যে আমি নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে দিয়েছি বিশদভাবে।”[১১]

মহান আল-াহ তাঁর অস্ড়িত্ব, সবকিছু যে তাঁরই সৃষ্টি এবং সমস্ড় সৃষ্টি যে তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে, এসব মানব মন্ডলীকে বোঝানোন জন্যে অসংখ্য নিদর্শন পেশ করেছেন। এসবের মাধ্যমে তাঁকে জানা ও চেনা যায়। আল-াহর নিদর্শন সমূহের কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নেই। সৃষ্টি প্রথম হতে অদ্যাবধি এবং শেষ পর্যন্ড় তাঁর অসীম নিদর্শনাবলী চিরস্থায়ী।[১২]

প্রাচীনকালের পাপী ও সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় আল-াহ ও তাঁর রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল-াহর হুকুমে সমূলে ধ্বংস হয়েছে। তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো

১১. আল কুরআন, ০৬:৯৭

১২. রফীক আহমাদ, *আল-াহর নিদর্শন* (মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১১)

এখনো পৃথিবীতে বিদ্যমান। ঐসব ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে কুর'আনে কিছু উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এ নিদর্শনগুলোর কথা মহান আল-াহ কুর'আন মজিদে উলে-খ করেছেন। মানুষ যেন এগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল-াহর অবাধ্য হওয়া ও নবী-রাসূলদের পথ পরিত্যাগ করাকে ভয় করে।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ •

"তারা কি দেখে না, আমরা তাদের আগে কতো জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। যমিনে তাদের এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যে রকম প্রতিষ্ঠা তোমাদেরকেও দেইনি। তাদের প্রতি আমরা মুষুলধারে বৃষ্টিপাত করেছিলাম, তাদের যমিনে নদ নদী প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম। তারপর তাদের পাপের কারণে আমরা তাদের হালাক করে দিয়েছি এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর একটি প্রজন্ম।"[১৩]

০১৩. আল কুর'আন, ০৬:০৬

৩য় অধ্যায়

আল কুর'আনে বর্ণিত আল-াহর অনুগ্রহের স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শন

কুর'আনে বর্ণিত কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পৃথিবীতে রয়েছে যেগুলোর সাথে জড়িত রয়েছে আল-াহর অবারিত অনুকম্পা এবং তাঁর রাসূল ও প্রিয় বান্দাদের স্মৃতি। আল-াহর অনুগ্রহ মিশ্রিত এ নিদর্শনগুলো মানুষের সাথে আল-াহ তা'য়ালার সম্পর্ককে গভীর করে তোলে। বিবেকবান মানুষ এগুলোর সম্মান করাকে আল-াহর সম্মান করার সমতুল্য মনে করে এবং এগুলোর ব্যাপারে অসৌজনতা করাকে আল-াহর সাথে অসৌজন্যেতামূলক আচরণ করা মনে করে।

وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّـهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ •

"এবং যে আল-াহ্র পবিত্র (স্থান ও অনুষ্ঠান) সমূহের প্রতি সম্মান দেখাবে, তার রবের কাছে সেটা হবে তার জন্যে উত্তম।"[১৪]

নিজের অন্ড়র দিয়ে আল-াহর নিদর্শনসমূহের চরম সম্মান প্রদর্শন করা প্রয়োজন। কেননা পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন তাই হতে পারে যাতে কোনো প্রকার অলসতা নেই।

আল-াহ তা'য়ালা নিজে উপকৃত হওয়ার জন্যে কারও ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব করেন নাই। আল-াহ এ সমস্ড় কিছু থেকে পবিত্র, অতি মহান। যা কিছু তিনি করেছেন বান্দার উপকারের জন্যেই করেছেন। আর এ উপকারিতা চরম পর্যায়ের সম্মান প্রদর্শন করাই দাবি করে।[১৫]

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّـهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ •

"তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল-াহ্র অনুগ্রহ গণনা করো তবে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল-াহ্ পরম ক্ষমাশীল, দয়াময়।"[১৬]

আল-াহ মানুষকে অসংখ্য নেয়ামত দিয়েছেন। নেয়ামতদাতাই ইবাদত লাভের যোগ্য। মানুষ প্রতিনিয়ত তার অসংখ্য নেয়ামত উপভোগ করছে কিন্তু আল-াহর ইবাদত থেকে বিমুখ। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজেকে আল-াহর কাছে সমর্পণ করে তার অক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করবে।[১৭]

---

১৪. আল কুর'আন, ২২:৩০

১৫. হযরত শাহ ওয়ালী উল-াহ মুহাদ্দেসে দেহ্লভী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০১, পৃষ্ঠা-১৮৫

১৬. আল কুর'আন, ১৬:১৮

১৭. কাযী ছানাউল-াহ পানিপথী (র.), *তাফসীরে মাযহারি*, অনুবাদ: মাওলানা তালেব আলী (নারায়ণগঞ্জ: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ১ম প্রকাশ-১৯৯৯), খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫০০

১ম পরিচ্ছেদ

এক অপূর্ব ঐতিহাসিক নিদর্শন: কা'বা শরীফ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ • فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا •

"নিঃসন্দেহে মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম যে ইবাদত গৃহটি নির্মিত হয় সেটি মক্কায় অবস্থিত। তাকে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে হিদায়াতের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং ইবরাহিমের ইবাদাতের স্থান। আর তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে যে প্রবেশ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে।"[১৮]

মানব কল্যাণের জন্যে তৈরি কা'বা ঘর আল্লাহ তা'য়ালার এক অপূর্ব সৃষ্টি। কা'বাঘরের স্মৃতি মানুষকে বিশ্ব সৃষ্টির সূচনায় নিয়ে যায়। কা'বা ঘরের আগে পৃথিবীর বুকে অন্য কোনো গৃহ বা ইবাদতের নির্দিষ্ট জায়গা নির্মিত হয়নি।

কা'বা নির্মাণের ইতিহাস

মক্কার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথমে ফেরেশতারা মক্কায় কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করে আল-াহর ইবাদত করেন। তখন যমিনে কোনো মানুষ ছিলো না। ফেরেশতারা আল-াহর নির্দেশে কা'বা তৈরি করে এখানে ইবাদত করেন। তখন যমিনের একমাত্র বাসিন্দা ছিলো জিন। পরে আল-াহ যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন এ কা'বাকে মানুষের ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করেন এবং হযরত আদম (আ.)-কে বেহেশত থেকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে মক্কাকে তাঁর বাসস্থান ও ইবাদতের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেন। তিনি মক্কার প্রথম আবাদকারী ও নবী। তিনি মক্কায় আসার পর শয়তানের ভয় করতে থাকেন এবং আল-াহর কাছে তার অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে আশ্রয় কামনা করেন। আল-াহ তখন মক্কার সীমানা পাহারা দেয়ার জন্যে ফেরেশতাদেরকে পাঠান। ফেরেশতারা যে সুনির্দিষ্ট এলাকাকে ঘিরে পাহারা দেন তাকে 'হুদুদে হারাম' বা 'হারাম এলাকা' বলা হয়।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আল-াহর নির্দেশে ফেরেশতারা কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। সপ্তম আকাশে বা দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে আকরিক পাথর দ্বারা নির্মিত একটি মসজিদ রয়েছে যার নাম 'বাইতুল-ইজ্জত' যাকে 'বাইতুল মামুর'ও বলা হয়। এটি কা'বা শরীফের বরাবরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদত গাহ। ফেরেশতারা

১৮. আল কুর'আন, ০৩:৯৬-৯৭

এখানে আল-াহর ইবাদতে মগ্ন থাকতো। মুসলিম জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ইবাদতের জন্যে একটি মসজিদ চেয়ে আল-াহর কাছে দোয়া করেন। তখন আল-াহর হুকুমে ফেরেশতারা বাইতুল মামুরের নকশা পৃথিবীতে ফেলেন। আর এর উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয় কা'বা ঘর। তারপর থেকেই নবী-রাসূলগণ তাওয়াফ করেছেন এ ঘরের চারিদিকে।

হযরত ইবরাহিম (আ.) কা'বার প্রথম নির্মাণকারী বলে প্রচলিত আছে। কিন্তু তিনি এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নন। তাঁর আগেই এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। কুর'আনে আয়াতেও এ কথার ইংগিত মিলে।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ •

"আর স্মরণ করো, ইবরাহিম এবং (তার পুত্র) ইসমাঈল যখন এ ঘরের ভিত উঠাচ্ছিল, তখন তারা (দোয়া করে) বলেছিলঃ আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের এ কাজ কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শোনো, সবকিছু জানো।"[১৯]

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ.) নিজে কা'বার ভিত্তি স্থাপন করেননি। বরং পূর্বের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির ওপর তিনি উপরের দিকে দেয়াল উঠান। তাহলে এ ভিত্তি অবশ্যই পূর্বে কেউ স্থাপন করেছেন। ফেরেশতারা অবশ্যই ভিত্তিহীন ঘরের ইবাদত করেননি এবং হযরত আদম (আ.)-ও নয়। তবে ফেরেশতা এবং হযরত আদম (আ.)-এর মধ্যে কে প্রথম এর ভিত্তি স্থাপন করেন তা নিশ্চিত জানা যায় না। ফেরেশতারা যেহেতু আগে এর ইবাদত করেছেন, তাই যুক্তিসংগত কারণে তারাই এর ভিত্তি স্থাপন করেন।[২০]

তারীখ ইমারাতুল মসজিদুল হারাম বই এর লেখক তাঁর বইতে ইবনে সোরাকার একটি বর্ণনা উলে-খ করে বলেছেন যে, কা'বার দরজার সামনে 'মোসাল-া আদম' অবস্থিত। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) সেখানে সালাত পড়েছেন। হযরত আদম (আ.) এর তৈরি কা'বা হয়তো দীর্ঘদিন পর মিটে গেছে। তারপর, আল-াহ তাঁর বিভিন্ন নবীদের ওপর ওহী নাযিলের মাধ্যমে কা'বা নির্দিষ্ট স্থান জানিয়ে দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী কা'বার নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের কাজ চলিতেছে। হযরত নূহ (আ.) এর মহাপ-াবনের সময় কা'বা শরীফ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুনরায় কা'বা নির্মাণের নির্দেশ দেয়া হয়।

---

১৯. আল কুর'আন, ০২:১২৭

২০. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *মক্কা শরীফের ইতিকথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল-১৯৮৯), পৃ.-১৯৯

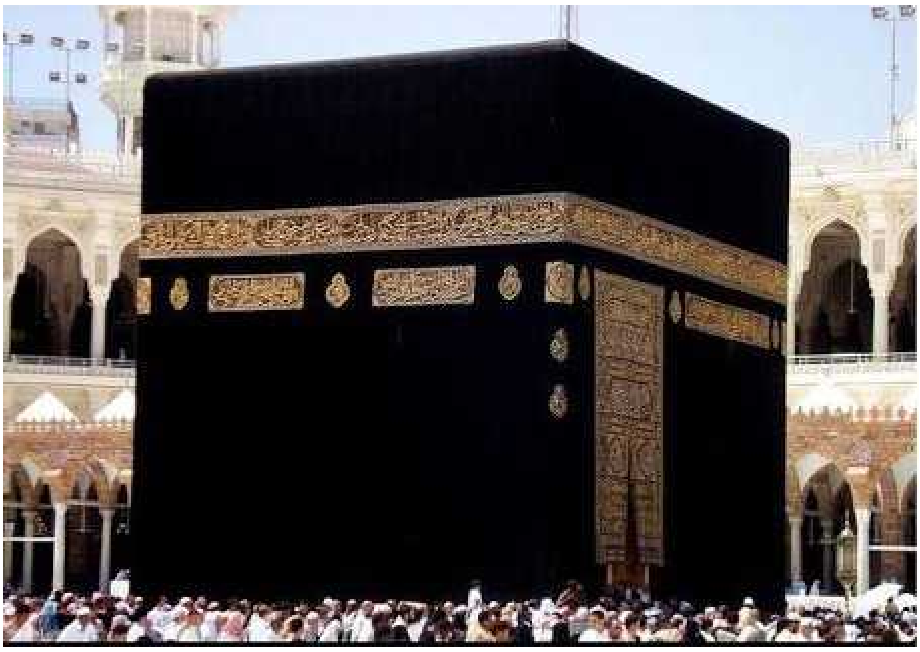

পবিত্র কা'বা ঘর

ইতিহাসে পর্যায়ক্রমে কা'বা শরীফ নির্মাণকারীদের সংখ্যা ১১ বলে উলে- খ করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন:

০১. ফেরেশতা, ০২. হযরত আদম (আ.), ০৩. হযরত শীষ (আ.), ০৪. হযরত ইবরাহীম (আ.), ০৫. আমালেকা সম্প্রদায়, ০৬. জোরহোম গোত্র, ০৭. কুসাই ইব্‌ন কিলাব, ০৮. কোরাইশ, ০৯. হযরত আবদুল-াহ ইব্‌ন যোবায়ের (রা.), ১০. হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ, এবং ১১. সুলতান মুরাদ।[২১]

অবশ্যই ঐতিহাসিকরা কা'বা শরীফ নির্মাণকারীদের সংখ্যার ব্যাপারে পুরো একমত হতে পারেননি। তবে তিনজন পুনঃনির্মাণকারীদের ব্যাপারে কারোর কোনো মতভেদ নেই। সেই তিনজন হচ্ছেন:

০১. হযরত ইবরাহীম (আ.), ০২. কোরাইশ, ০৩. হযরত আবদুল-াহ ইব্‌ন যোবায়ের (রা.)।

কা'বা শরীফ নির্মাতাদের ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে এ কথা বলা যায় যে, ঐ এগারো জন কা'বা শরীফের পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও মেরামতের ব্যাপারে কম-বেশি অংশ নিয়েছেন।[২২]

কা'বা শরীফের বিভিন্ন নাম

বাইতুল-াহ শরীফের মূল ভিত্তি গোলাকৃতির বলে তাকে কা'বা বলা হয়। কেননা কা'বা অর্থ গোলাকৃতি। এর অপর নাম হচ্ছে: 'আল-বাইতুল আতিক'। এর অন্য নাম হচ্ছে, 'আল-বাইতুল হারাম'। এর আরেকটি নাম আছে। সেটি হচ্ছে 'আল বিনইয়াহ'।[২৩]

কা'বা শরীফের আকৃতি

আল-াহর নির্দেশে হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈলকে সংগে নিয়ে ঐ একই জায়গায় চার দেয়ালের পবিত্র ঘরটি নির্মাণ করেন। কা'বা ঘরের সেই কাঠামোই এখনো বিদ্যমান। বর্গাকৃতির এ কা'বা ঘরের উচ্চতা ৩৯ ফুট ৬ ইঞ্চি। পূর্ব দেয়াল ৪৮ ফুট ৬ ইঞ্চি, পশ্চিম দেয়াল ৪৬ ফুট ৫ ইঞ্চি, উত্তর দেয়াল ৩৩ ফুট ও দক্ষিণ দেয়াল ৩০ ফুট।

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ.-১২০

২২. প্রাগুক্ত

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-১২৭

বর্গাকৃতির কা'বা শরীফ

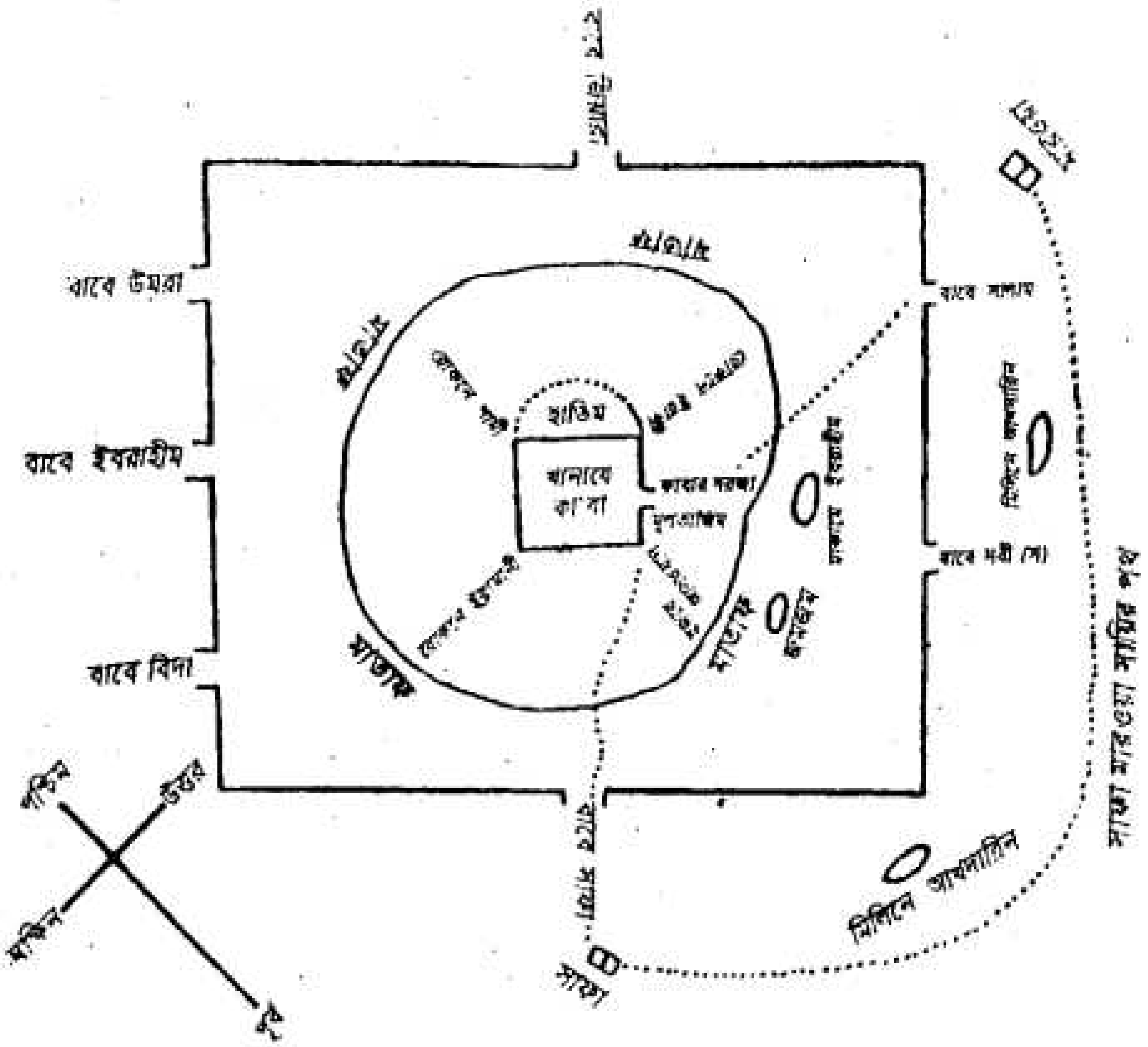
বাবে উমরা
বাবে ইবরাহীম
বাবে বিদা
খানায়ে কা'বা
হাতিম
কা'বার দরজা
মাতাফ
সাফা
মিলিনে আখযারাইন
উত্তর
পশ্চিম

কা'বা শরীফের নকশা

কাবা ঘরের দরজা

হাজারে আসওয়াদ

'হাজারে আসওয়াদ' এর আভিধানিক অর্থ কালো পাথর। কা'বা শরীফের পূর্ব কোণে হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত। এটি আল-াহর পক্ষ থেকে উম্মতে ইসলামিয়ার জন্যে অতি প্রাচীন নিদর্শন। এটি একটি বেহেশতী পাথর। নবী করিম (সা.) ঐ পাথরটিকে চুমু দিয়েছেন। এতে চুমু দেয়ার ফযিলত অনেক বেশি।

আবেস ইবনে রাবীয়া (রা.) উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা.) হাজারে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন:

"আমি জানি তুমি একখানা পাথর, তোমার উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসূলুল-াহ (সা.)-কে তোমার গায়ে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুমু দিতাম না।"[২৪]

মূলত এ পাথরকে চুমু দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল-াহর রাসূলের আনুগত্য করা।

কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) এ পাথরটি কা'বার পূর্ব কোণে লাগান। রাসূলুল-াহ (সা.) এর নবুওয়্যাতের পূর্বে কোরাইশরা যখন কা'বা পুনঃনির্মাণ করে, তখনও তিনি নিজ হাতে কা'বার দেয়ালে হাজারে আসওয়াদটি লাগিয়ে কোরাইশদের সম্ভাব্য সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটান।[২৫]

হাজারে আসওয়াদটি বাইতুল-াহ শরীফের সবচাইতে মর্যাদাবান জায়গায় তথা পূর্ব কোণে অবস্থিত। এটি হযরত ইবরাহীম (আ.) এর তৈরি মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি তাওয়াফ শুর"র স্থানে অবস্থিত।

সালেম (রা.) তাঁর পিতা (আবদুল-াহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল-াহ) বলেছেন, আমি রাসূলুল-াহ (সা.) দেখেছি যখন তিনি মক্কা আগমণ করেন তখন প্রথমে তাওয়াফে হাজারে আসওয়াদে চুমু দিতেন এবং সাত তাওয়াফের প্রথম তিন তাওয়াফে রমল করতেন।[২৬]

মূলত হাজারে আসওয়াদের মূল রহস্য হচ্ছে, জ্ঞান ও বিবেকের পরীক্ষা নেয়া। এর প্রতি মানব মনের সাড়ার প্রকৃতি জানা এবং আল-াহর হুকুমের প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা। বান্দাহ এর মূল কারণ জানুক বা না জানুক, উভয় অবস্থায়ই আল-াহর ইবাদত ও হুকুম মানা জর"রী। তাই হাজারে আসওয়াদের অস্তিত্ব আল-াহর সার্বিক আনুগত্য এবং ইবাদতের অংশ বিশেষ।

---

২৪. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, সম্পাদনা: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল-১৯৮২), খন্ড-০২, পৃ.-১০০, হাদীস নং-১৪৯৩

২৫. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৩২

২৬. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৩, হাদীস নং-১৪৯৯

হাজারে আসওয়াদ

কাবা শরীফের পূর্ব কোণে অবস্থিত হাজারে আসওয়াদ

মাকামে ইবরাহীম

মহান আল্লাহর অফুরন্ড় নিদর্শনের একটি হচ্ছে ‘মাকামে ইবরাহীম’। এ পাথরে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ করেছিলেন কা’বা ঘর। আর এ পাথর ধারণ করে রেখেছে ইবরাহীম (আ.) এর পায়ের ছাপ।

মহান আল-াহ পবিত্র কুর’আনে বলেন:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ •

“আর সেই সময়কার কথা স্মরণ করো, যখন আমরা এ (কা’বা) ঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপত্তার স্থল বানিয়ে দিয়েছিলাম, আর (মানুষকে বলেছিলাম:) ‘তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে মুসাল-া (নামাযের স্থান) বানাও।’ ইবরাহিম আর ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম: ‘তোমরা আমার (কা’বা) ঘরকে পবিত্র করো তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং র“কু সাজদাকারীদের জন্যে।”[২৭]

মুসলিম উম্মাহর জন্যে এটি একটি প্রাচীন নিদর্শন। আল-াহ তা’য়ালা মাকামে ইবরাহীমের কাছে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। একে চির স্মরণীয় করে দিয়েছেন।

মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায়ের নির্দেশ বাস্ড়বায়নের জন্যে তাওয়াফ শেষে দু’রাকাত সালাত, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়তে হবে। সুন্নাত হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীম ও কা’বা শরীফকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে হবে। কেননা, রাসূল (সা.) এভাবেই মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায় করেছেন।

আমের ইবনে দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন:

“আমি ইবনে উমর (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা.) মক্কায় আগমণ করে সাতবার বায়তুল-াহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন, অতঃপর সা’ঈ করার জন্যে সাফা মারওয়ার দিকে গমন করলেন। মহান ও শক্তিমান আল-াহ বলেছেন, তোমাদের অনুসরণের জন্যে আল-াহর রাসূলের জীবন উত্তম আদর্শ রয়েছে।”[২৮]

২৭. আল কুর’আন, ০২:১২৫

২৮. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০২, পৃ.-১১১, হাদীস নং-১৫১৯

মাকামে ইবরাহীম কা'বা ঘরের পাশে অবস্থিত একটি বর্গাকৃতির পাথর। একটি লোহার বেষ্টনীর ভেতর একটি ক্রিস্টালের বাক্সে এ পাথরটি রাখা আছে। পাথরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান। প্রায় ১৮ ইঞ্চি।[২৯]

দীর্ঘ ৪ হাজার বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মাকামে ইবরাহীমে এখন পর্যন্ড় পায়ের চিহ্ন অপরিবর্তীত রয়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ড় অব্যাহত থাকবে। কেননা আল-াহ একে স্থায়ী নিদর্শন হিসেবে কুর'আনে উলে-খ করেছেন।

মহান আল-াহ তা'য়ালার এ নিদর্শনগুলোকে মর্যাদা দেয়া মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য।

---

২৯. onushilon.org > history > mohammadibrahim

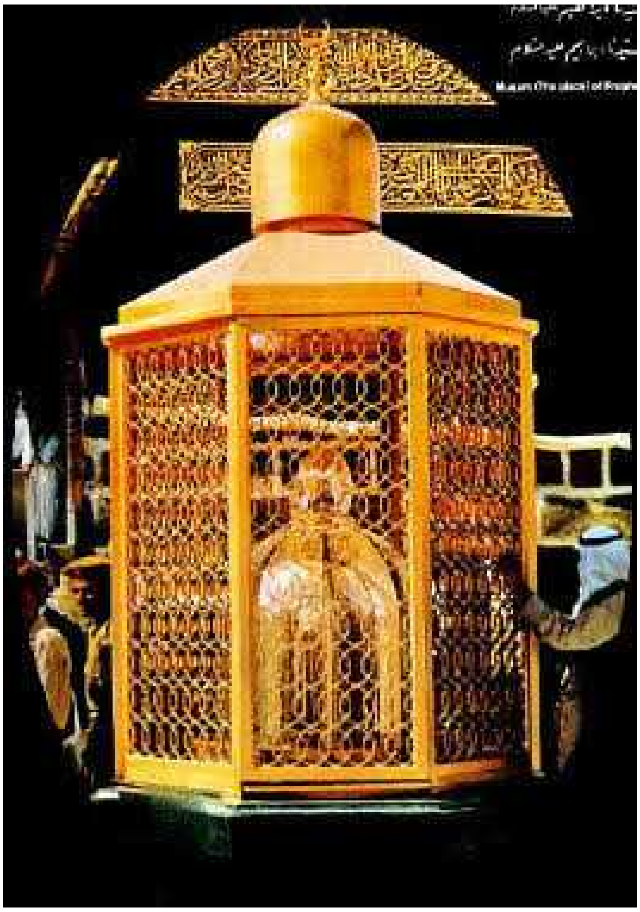

মাকামে ইবরাহীম

মাকামে ইবরাহীমে রক্ষিত ইবরাহীম (আ.)-এর পায়ের চিহ্ন

কা'বা শরীফের মর্যাদা

চার দেয়ালের কালো পাথরের এ ঘরের আধ্যাত্মিক আকর্ষণের কারণে দুনিয়ার মুসলিমগণ পাগলপারা। এ ঘরের অতুলনীয় কথা মহান আল-াহ পবিত্র কুর'আনে বলেছেন। এমনকি বান্দার কাছে নিজের পরিচয়ের দলিল হিসেবে সূরা কুরাইশে আল-াহ তা'য়ালা বলেছেন:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ •

"তাদের উচিত এ ঘরের মালিকের ইবাদত করা।"[৩০]

ধূ ধূ মরুর বুকে এ ঘরটি তৈরি করা হয়। তারপর মহান আল-াহ এর আশেপাশের অধিবাসীদের আহার্য সরবরাহের চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জাহেলিয়াতের কারণে আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত সমগ্র আরব ভূখন্ডে চরম অশান্তি ও নিরাপত্তা হীনতা বিরাজ করছিলো। কিন্তু এ বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ দেশটিতে একমাত্র কা'বা ঘর ও তার আশেপাশের এলাকাটি এমন ছিলো যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিলো কা'বা আক্রমণকারী আবরাহার সেনাবাহিনী কিভাবে আল-াহর রোষানলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো।[৩১]

কা'বা ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মূলত আল-াহর প্রতিই সম্মান প্রদর্শন। এতে কম করার অর্থ আল-াহর সম্মানে অবহেলা করা। তাই কা'বার হজ্জ ফরয হয়েছে। একে পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেবলাহমুখী হয়ে সালাত আদায়ের আর এ সবকিছুর মাধ্যমেই মূলত আল-াহর প্রতি সম্মান করা হবে।[৩২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল-াহ (সা.) বলেছেন, যে আল-াহর ঘরে প্রবেশ করে সে নেক ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যখন বের হয় তখন গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বের হয়।

আল-াহর ক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন কা'বা ঘর ঈমানদারদের প্রাণ জুড়ায়। মুসলিমগণ কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। প্রতি বছর লাখ লাখ মুসলিম কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে মক্কা গমন করে। প্রতি মুহুর্তে অঝর ধারায় আল-াহর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হচ্ছে অপূর্ব নিদর্শন এ কা'বার ওপরে।

---

৩০. আল কুর'আন, ১০৬:০৩

৩১. হযরত শাহ ওয়ালী উল-াহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০১, পৃ.-১৮৬

৩২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমুল কুর'আন*, অনুবাদ: মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল- মার্চ ২০০৫) খন্ড-০৩, পৃ.-১৫২

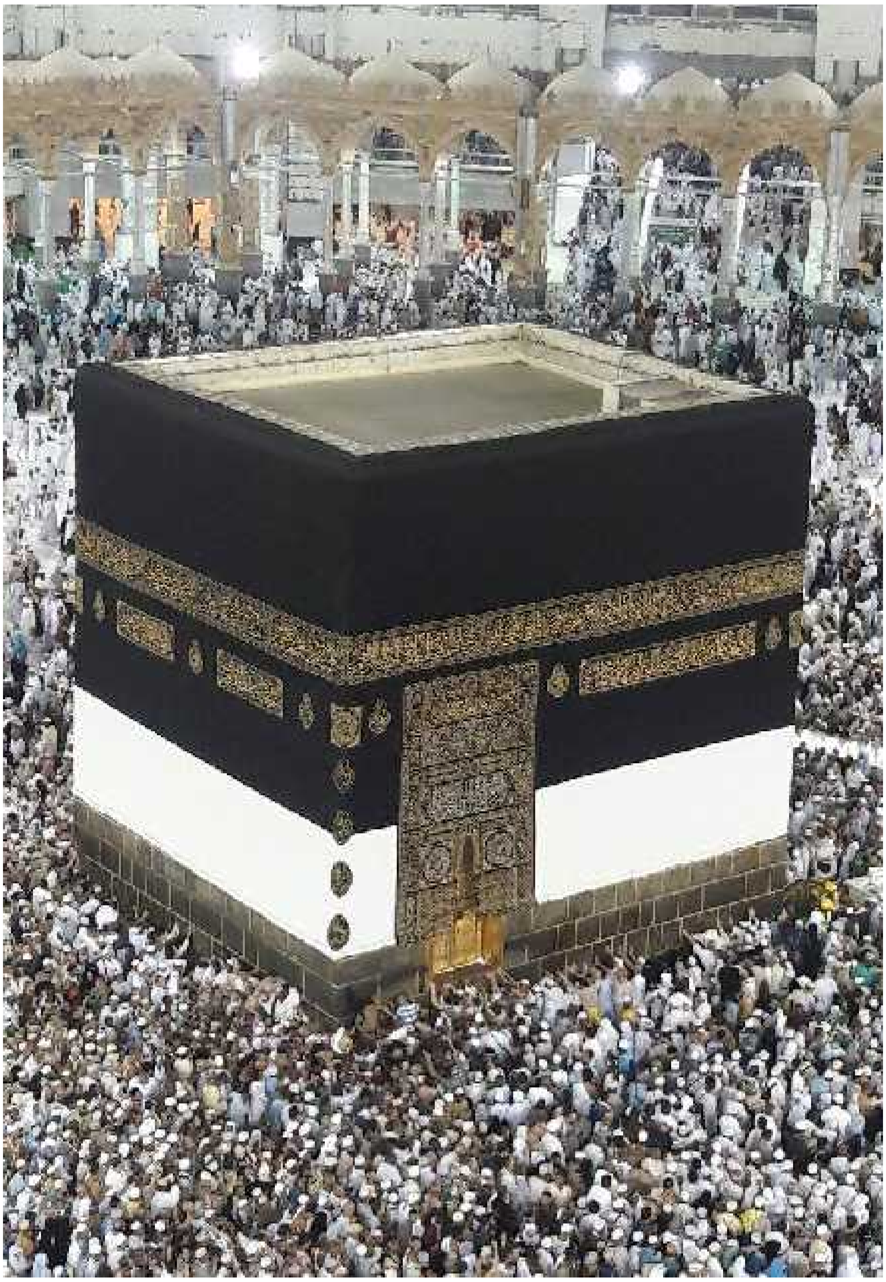

কা'বা ঘর তাওয়াফের দৃশ্য

২য় পরিচ্ছেদ

স্মৃতি বিজড়িত পাহাড়: সাফা ও মারওয়া

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ •

"নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল-াহর নিদর্শনাবলীসমূহের অন্ড়র্ভুক্ত।"[৩৩]

সাফা ও মারওয়া মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী দুটি পাহাড়। ঐতিহাসিক এ নিদর্শনটির মধ্যে রয়েছে আল-াহর প্রিয় বান্দাদের স্মৃতি। একজন মায়ের তাঁর সন্ড়ানের জন্যে গভীর আত্মত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত এ

দুটি পাহাড়। এ পাহাড় দুটি হজ্জ ও উমরাহর সাথে সম্পর্কিত।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনায় এসেছে, ইবরাহিম (আ.) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপায়ী সন্ড়ান ইসমাঈলকে নিয়ে মক্কায় এসেছিলেন। সে সময় মক্কায় কোনো মানুষ ছিলো না এবং কোনো খাদ্যদ্রব্যও ছিলো না।

আল-াহর আদেশে হযরত ইবরাহিম (আ.) হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে অল্প কিছু খাদ্যদ্রব্য সহ সাফা ও মারওয়ার কাছে মরুভূমিতে রেখে আসেন। তাদের খাবার ও পানি শেষ হয়ে যাবার পর হাজেরা পানির জন্যে এ দুটি পাহাড়ের মাঝে সাতবার আসা যাওয়া করেন। এ সময়ে তিনি ইসমাঈলকে মরুভূমিতে রেখে যান।

প্রথমে তিনি আশেপাশের এলাকা দেখার জন্যে সাফা পাহাড়ে ওঠেন। কিছু না দেখার পর তিনি পার্শ্ববর্তী মারওয়া পাহাড়ে ওঠেন। পাহাড়ের চূড়া থেকে তিনি ইসমাঈলকে দেখতে পাচ্ছিলেন কিন্তু মধ্যবর্তী স্থান থেকে তাকে দেখা সম্ভব হচ্ছিলো না। ফলে তিনি এই অংশে স্বাভাবিকের চেয়েও দ্রুত এগিয়ে যান। এভাবে তিনি সাতবার দুটি পাহাড়ের মাঝখানে সা'ঈ করেন বা দৌড়িয়ে যান।[৩৪]

আল-াহ রাব্বুল আলামিন হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে হজ্জের যে সমস্ড় অনুষ্ঠান শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সা'ঈ করা বা দৌড়ানো ছিলো অন্যতম। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতটি চক্কর দেয়ার নাম সা'ঈ। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্যে পানি সংগ্রহের জন্যে হাজেরার এ ছোটাছুটি মহান আল-াহ তা'য়ালা এতো পছন্দ করেছিলেন যে প্রত্যেক হাজিকে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে বারবার সা'ঈ করতে হয়।[৩৫]

---

৩৩. আল কুর'আন, ০২:১৫৮

৩৪. তথ্যসূত্রঃ *Wikipedia*, the free encyclopedia.

৩৫. অনলাইন পত্রিকা: *সত্য নিয়ে নারী যাবে এগিয়ে*, ০২ মার্চ ২০১৫

সাফা পাহাড়

মারওয়া পাহাড়

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার রাস্ড়াটি আল-াহর পবিত্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এ দুই পাহাড়ের মধ্যে সা'ঈ করা হানাফি মাযহাবে ওয়াজিব এবং শাফেঈ, হাম্বলী এবং মালেকি মাযহাবের এক রেওয়াতে ফরয ও হজ্জের অন্যতম র‍ূকন। সাফা পাহাড় অপেক্ষাকৃত কম উঁচু এবং পার্শ্ববর্তী উঁচু জাবালে আবু কো'বাইসের একটি অংশ। সেটি বর্তমানে, বাবুস সাফা সংলগ্ন। এটি মসজিদে হারামের দক্ষিণে অবস্থিত। অপরদিকে মারওয়া হচ্ছে, মসজিদে হারামের পূর্ব-উত্তরে কুআইকাআন পাহাড়ের একটি অংশ। মারওয়া পাহাড়ও অপেক্ষাকৃত নীচু। এটি বাবুল মারওয়া সংলগ্ন। সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার রাস্ড়াটিকে মাসআ' বলা হয়। এ রাস্ড়া দিয়েই দুই পাহাড়ের মধ্যে সা'ঈ করতে হয়। এ রাস্ড়াটির (মাসআ') দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০৫ মিটার।[৩৬]

পবিত্র স্থানসমূহের যে সকল জায়গায় দোয়া কবুল হয়, সাফা মারওয়া তার অন্যতম। এজন্যে এ দুই স্থানে দোয়া করা উচিত। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল-াহ (সা.) তাওয়াফ শেষে সাফা পাহাড়ের উপরে উঠেন এবং বাইতুল-াহর দিকে তাকিয়ে দুই হাত তুলে আল-াহর প্রশংসা ও দোয়া করেন।[৩৭]

আমর ইবনে দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন:
"আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, নবী (সা.) মক্কায় আগমণ করে বাইতুল-াহ তাওয়াফ করলেন, দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং তারপর সাফ ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন- "তোমাদের জন্যে আল-াহর রাসূলের জীবনে রয়েছে অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ ও নমুনা।"[৩৮]

আল-াহ তা'য়ালার প্রিয় বান্দাদের স্মৃতি বিজড়িত এ পাহাড় দুটি পৃথিবীর মানুষদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কুর'আনের সত্যতা।

---

৩৬. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৪৪

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৪৭

৩৮. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০২, পৃ.-১২১, হাদীন নং-১৫৩৫

সাফা-মারওয়ায় সা'ঈর দৃশ্য

৩য় পরিচ্ছেদ

রহস্যে ঘেরা যমযম কূপ

পবিত্র কা'বাঘরের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত কূপটি হচ্ছে যমযম কূপ। এ কূপটি আল-াহর কুদরতের এক মহা নিদর্শন। পৃথিবীতে যতো আশ্চর্যজনক সৃষ্টি রয়েছে যমযম কূপ তার অন্যতম। এর পানি কখনোই নিঃশেষ হয় না।

যমযম, কূপ হলেও তার সেবা একটি নদীর সমান। নদীর অসীম পানির মতই যমযমের পানি গোটা দুনিয়ায় পান করা হচ্ছে এবং হাজীরা দূর থেকে দূরান্ড়রে সাথে করে এ পবিত্র পানি নিয়ে যাচ্ছে। হজ্জ মওসুমে প্রতিদিন ১৯ লাখ লিটার পানি সেবন করা হয়। দুনিয়ার অন্য যে কোনো কূপ থেকে এর উৎপাদন ও সরবরাহ অনেক বেশি।[৩৯]

যমযম কূপের ইতিহাস

হযরত ইবরাহিম (আ.) এর স্ত্রী হাজেরা পানির খোঁজে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার ছোটাছুটি করেন। এরপর তিনি মর‍ুভূমিতে ফিরে এসে দেখতে পান, তৃষ্ণায় ছটফট ক্রন্দনরত শিশু ইসমাঈল (আ.) এর পায়ের আঘাতে মাটি ফেটে পানির ধারা বের হচ্ছে। মহান আল-াহর অপার কর‍ুণায় জিবরাঈল (আ.) এর স্বীয় পাখার আঘাতে মর‍ুভূমির শুষ্ক মাটি থেকে এ কুদরতি ঝর্ণা ধারা নিঃসরিত হয়। হাজেরা এ ঝর্ণা পাথর দিয়ে বেঁধে দেন। এরপর থেকেই এটি যমযম কূপ নামে পরিচিত।

বিগত ষাটের দশকে বাদশাহ খালেদের শাসনামলে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যমযম কূপ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এ কাজে তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত প্রকৌশলী ইয়াহইয়া কোশকের প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বড় ধরনের কয়েকটি পাথরের তলদেশ থেকে প্রবল বেগে পানি উৎসারিত হচ্ছে।[৪০]

খলিফা মামুনুর রশীদের আমলে এ কূপ খনন করা হয়। এ সময় পানির নিঃসরণ খুব বেড়ে গিয়েছিলো। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর সৌদি সরকার আধুনিক মেশিনের সাহায্যে কূপকে পুনঃখনন করেন। দু'জন ডুবরী কূপের তলদেশে গিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে দেখেন, সেখানে রং বেরংয়ের মাটির স্ড়্র জমাট বেঁধে আছে। আর অবিরাম নির্গত পানিকে পরিশোধন করছে। তারা আল-াহর এ কুদরত দেখে বিষ্মিত হয়ে যান। বর্তমানে যমযম কূপের গভীরতা ৫১ ফুট। এ কূপের মাটি তিন স্ড়্র বিশিষ্ট। প্রথম স্ড়্র ১৩.৫ মিটার সচ্ছ সাদা পলি মাটি দিয়ে গঠিত যাকে ওদী ইবরাহিমের পলি বলে। এরপর ০.৫ মিটার ছিদ্রযুক্ত কালোপাথর Permeable weathered rock দ্বারা গঠিত। এরপর ১৭ মিটার এক প্রকার ধূসর রং এর Diorite Bedrock নামে পাথর দ্বারা গঠিত।

---

৩৯. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.-২২

৪০. প্রাগুক্ত

যমযম কূপ

যমযম পানির ফযীলত

আযরাকী লিখেছেন, ওহাব ইবন মোনাব্বেহ যমযম সম্পর্কে বলেন: আল-াহর কসম, এটি আল-াহর কিতাবে উত্তম, কল্যাণকর, নেককারদের পানীয়, ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং রোগের চিকিৎসা হিসেবে লিখিত আছে।[৪১]

আযরাকী যানজি থেকে এবং তিনি ইবনে খায়সম থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার ওহাব ইবনে মোনাব্বেহ আমাদের কাছে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে ছিলো কিছু যমযমের পানি। আমরা বললাম, আপনি কিছু মিষ্টি পানি (স্বাভাবিক পানি) কেন পান করছেন না? যমযমের পানি তো যথেষ্ট লবণাক্ত। তখন তিনি জবাব দেন, আমার অসুখ ভালো হওয়ার আগ পর্যন্ড় আমি অন্য কোনো পানি পান করবো না। যার হাতে ওহাবের প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল-াহর কিতাবে এটি যমযম হিসেবে লিখিত; এটি কখনও শুকাবে না এবং ক্ষতিকর হবে না; এটি আল-াহর কিতাবে উপকারী এবং নেককার লোকদের পানীয় হিসেবে লিখিত আছে; এটি আল-াহর কিতাবে উত্তম বলে বিবেচিত। এটি আল-াহর কিতাবে ক্ষুধা নিবারণ এবং রোগের চিকিৎসা হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। ওহাবের প্রাণ যে সত্তার হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি, কেউ যদি পেট ভর্তি করে এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ত করে তা পান করে অবশ্যই তার রোগের চিকিৎসা হবে এবং সে রোগ মুক্ত হবে। [৪২]

হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: জাহেলিয়াতের সময় লোকেরা একবার ভীষণ অভাবের সম্মুখীন হয়। ফলে খাবার সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন লোকেরা যমযমের পানির জন্যে ছুটে আসে, পরিবারসমূহ শিশুদেরকে নিয়ে ভোরে যমযমে হাজির হতো। তখন শিশুদের বাঁচানোর জন্যে যমযমকে একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হতো।[৪৩]

হাকীম তিরমিযি বলেন, যমযমের পানি থেকে উপকার পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে নিয়তের গভীরতা ও পরিপক্কতার উপর। খালেস নিয়তে ঐ পানি ব্যবহার করলে তার উপকার অবশ্যম্ভাবী। গত ০১.০৩.১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে মোতাবেক, ২৩শে রজব ১৪০৯ হিজরি তারিখে জেদ্দা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ওকাজ পত্রিকা 'যমযমের পানি সেবনে পঙ্গুত্বসেরে গেছে, এ শিরোনামে খবর দিয়েছে যে, সম্প্রতি বৃটেনের একটি পঙ্গু স্কুলের ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে দু'জন ডাক্তার ও দু'জন সুপারভাইজার মক্কা ও মদিনা যিয়ারতে আসেন। ছাত্র প্রতিনিধি দলে ভারত এবং পাকিস্ড়ানের কিছু পঙ্গু ছাত্র-ছাত্রীও অন্ডর্ভুক্ত ছিল। তারা প্রথমে মদিনা সফর করেন এবং পরে মক্কায় উমরাহ আদায় করেন। প্রতিনিধিদলে, ৯ বছর বয়স্কা রাইয়ানা নামক একটি বালিকার দুই হাত

৪১. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৪
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৪
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৫

স্থায়ীভাবে পঙ্গু ছিলো এবং সে তা নাড়াচাড়া করতে পারতো না। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেলো যে, সে তার হাত নাড়াচাড়া করতে পারে এবং তার হাতের পঙ্গুত্ব সেরে গেছে। এটা দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু একই দিন প্রতিনিধিদলের আরো তিনজন শিশুর মধ্যেও আরোগ্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়। এর মধ্যে ১৫ বছর বয়স্কা একজন মেয়ে বাম চোখে দেখতো না। কিন্তু গতকাল ২৮শে ফেব্রুয়ারীর সকাল বেলায় সে বাম চোখে দেখা শুরু করে। অন্য এক শিশুর পা স্থায়ীভাবে পঙ্গু ছিলো, পায়ের উপর ভর করে চলতে পারতো না। কিন্তু এখন সে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্য আরেক শিশু বোবা ছিলো। সে এখন কথা বলতে পারে। তাদের আরোগ্য লাভের পর যারা তাদের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছে, সবাই বলেছে মযবুত ঈমানের সাথে যমযমের পানি পান করার কারণে আল্লাহ তাদের অসুখ ভালো করে দিয়েছেন।[৪৪]

যমযম পানির বৈশিষ্ট্য

ইমাম বদরুদ্দিন ইবন্ সাহেব মিসরী যমযমের পানিকে অন্য পানির সাথে তুলনামূলক ওযন করে দেখেছেন যে, যমযমের পানি অন্য পানির চাইতে এক চতুর্থাংশ বেশি ভারী। তারপর তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা করে বলেন, এটি অন্য যে কোনো পানির চেয়ে সেরা এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটিকে তিনি অন্য সকল পানির চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দেখতে পেয়েছেন।[৪৫]

'আত্-তারীখ আল কাদীম লি-মক্কাহ ওয়া বাইতিল্লাহিল কারীম' বই এর লেখক আল কুর্দী যমযমের পানিতে রোগ-জীবাণুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেন ঃ

০১. আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এই উষর মরুভূমিতে আল্লাহর হুকুমে জিবরীল (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্যে এ কূপটি বের করেন।
০২. এটি কা'বা এবং মহান নিদর্শন সাফা-মারওয়ার দিক থেকে উৎসারিত।
০৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর মক্কা থেকে যমযমের পানি মদিনায় পাঠাতে বলেছেন।
০৪. রাসূলুল্লাহ (সা.) এ পানি পেট ভর্তি করে পান করতে উৎসাহিত করেছেন।
০৫. যমযমের পানি খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা এবং অন্য যে কোনো নিয়তে পান করা হলে তা পূরণ হবে এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে একাধিক হাদিস বর্ণিত আছে।
০৬. হযরত জিবরাঈল (আ.) যমযমের পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বুক চিরে তা ধুয়েছেন।

---

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৭-৩৮
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৯

০৭. বহু সংখ্যক নবী, নেক বান্দাহ, আলেম, ইমাম এ পানি পান করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ড় অগণিত মানুষ এ পানি পান করবে।[৪৬]

যমযমের পানির রং অন্য পানির রং এর মতো হওয়া সত্ত্বেও এর স্বাদ অন্য যে কোনো পানির চেয়ে ভিন্ন। এছাড়াও রয়েছে এর অগণিত কল্যাণ ও উপকার। অতীতে লোকেরা চিকিৎসা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনকে সামনে রেখে যমযমে পানি পান করে উপকার পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগেও যারা অনুরূপ নিয়ত করে যমযমের পানি পান করেছে তারাও সমান উপকার পাচ্ছে। অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ড় যমযমের পানি পান করার কারণে ক্ষতি হওয়ার কোনো রেকর্ড নেই। যদিও ধরে নেয়া হয় যে, বন্যা বা বৃষ্টির পানিতে এতো রোগ জীবাণু প্রবেশ করেছে সেটি আল-াহর কুদরতী কূপে তাঁরই ইশারায় নষ্ট হয়ে যায়। এতে পানির ওপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।

যমযম কূপ নিয়ে ডাঃ মাশারো ইমাটোর গবেষণা

বিজ্ঞানের সূচনালগ্নের অনেক পরে যমযমের পানির নতুন রহস্য প্রকাশ হয়েছে যা গৌরবময় কুর'আনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

জাপানি বিজ্ঞানী ডাক্তার মাশারো ইমাটো যমযমের পানির ওপর ১৫ বছর স্থায়ী এক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি এর ওপর ০৫ খ ের একটি বই রচনা করেন যার নাম "পানির থেকে বার্তা"। সেখানে তিনি লিখেন, "আমি প্রমাণ করেছি যে, ঐ বিশেষ তরলটি চিন্ড়া করার, মাপার, বোধ করার, উত্তেজিত করার এবং নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে।"

ডাঃ ইমাটো আরো লিখেছেন, যমযম পানির গুণ বা বিশুদ্ধতা পৃথিবীর অন্য কোনো পানিতে পাওয়া যাবে না। যমযম পানির ওপর গবেষণা করে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, এর এক ফোঁটা পানি নিয়মিত পানির ১০০০ ফোঁটাতেও যদি মিশ্রিত হয় তবুও তা যমযমের পানির সমান গুণ লাভ করতে পারবে না। কিছু পরীক্ষাতে তিনি দেখতে পান যে, যমযম পানির গুণ বা উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না। এমনকি তিনি এ পানির পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে দেখেন, এতে কোনো পরিবর্তন হয়নি এটি বিশুদ্ধ ছিলো।[৪৭]

---

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪০

৪৭. মহান আল−াহর মহাসৃষ্টি পানি ও এর বার্তা, bangla.irib.ir ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১১

যমযম কূপের ভেতরের অংশ

বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে যমযম কূপের রহস্য

০১. ৪০০০ বছর পূর্বে সৃষ্ট যমযম কূপের পানির স্বাদ ও বিভিন্ন উপাদান কখনোই পরিবর্তন হয় না। এতে জন্মায় না কোনো ছত্রাক বা শৈবাল।

০২. ভারী মোটরের সাহায্যে প্রতি সেকেন্ডে ৮০০০ লিটার পানি উত্তোলন করার পরও পানি ঠিক সৃষ্টির সূচনাকালের ন্যায়।

০৩. সারাদিন পানি উত্তোলন শেষে মাত্র **১১** মিনিটেই আবার পূর্ণ হয়ে যায় কূপটি।

০৪. এই কূপের পানি কখনো শুকায় না। সৃষ্টির পর থেকে একই রকম আছে এর পানি প্রবাহ। এমনকি হজ্জ মউসুমে এর ব্যবহার কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ পানির স্ড়র কখনো নিচে নামে না।

০৫. এই কূপের পানির মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সল্ট এর পরিমাণ অন্যান্য পানির থেকে বেশি। এজন্যে এ পানি যে শুধু পিপাসা মেটায় তা না বরং এ পানি ক্ষুধাও নিবারণ করে।

০৬. এই পানি ফ্লুরাইডের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এতে কোনো জীবাণু জন্মায়না।

সুবহানাল-াহ! নিশ্চয়ই রহস্যে ঘেরা এ যমযম কূপ মহান আল-াহর এক অপূর্ব নিদর্শন।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ •

"আমরা অচিরেই তাদের দেখাবো আমাদের নিদর্শনাবলি মহাবিশ্বে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুর'আন এক মহাসত্য। তোমার রবের ব্যাপারে কি একথা যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী?"[৪৮]

---

৪৮. আল কুর'আন, ৪১:৫৩

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক বায়তুল মুকাদ্দাসঃ এক অনুপম নিদর্শন

বায়তুল মুকাদ্দাস বা আল আকসা মসজিদ ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত একটি অন্যতম পবিত্র স্থান। এটিই হলো মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা এবং মক্কা মুকাররমাহ ও মদিনা মুনাওয়ারার পরে তৃতীয় পবিত্র স্থান। বায়তুল মুকাদ্দাস নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত একটি জায়গা। এখানে রয়েছে অসংখ্য নবী-রাসূলের রওযা। ওহী ও ইসলামের অবতরণস্থল এ নগরী ছিলো নবীগণের দ্বীন প্রচারের কেন্দ্রভূমি। রাসূল (সা.) মসজিদুল হারাম, মদিনার মসজিদুন নববী ও বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরকে বিশেষভাবে সওয়াবের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা অন্য কোনো মসজিদ সম্পর্কে করেননি। রাসূল (সা.) মিরাজে যাওয়ার পথে আল আকসা মসজিদে যাত্রা বিরতি করেছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয়েছিলো তাঁর উর্ধ্বাকাশ যাত্রা। তাই এ পবিত্র নগরীর প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়েই রয়েছে গভীর ভালোবাসা।

নবী-রাসূলগণের প্রাণ কেন্দ্র আল আকসা মসজিদ বর্তমানে জেরুজালেমের ওল্ড সিটি এলাকায় অবস্থিত। আর আকসার পাশেই অনুপম স্থাপত্যশৈলির আরেকটি দৃষ্টিনন্দন ইমারত রয়েছে তার নাম "কুব্বাতুস সাখরা।" মিরাজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু যে পাহাড়ে পা রেখে বোরাকে চড়েছিলেন তাকে কেন্দ্র করে খলিফা আবদুল মালিক ইবন্ মারওয়ান প্রথম এ ইমারতটি নির্মাণ করেন।

হযরত ইবরাহিম (আ.) কা'বা ঘর নির্মাণের ৪০ বছর পর হযরত ইয়াকুব (আ.) জেরুজালেমে আল আকসা মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত সুলাইমান (আ.) এ মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেন। আল কুদস কমিটি প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ থেকে এ মসজিদের ইতিহাস জানা যায়। ৬৩৮ ঈসায়ি সালে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধের মাধ্যমে খৃষ্টানদের হাত থেকে পুরো বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকা মুসলিমদের অধিকারে আসে। ১০৯৬ সালে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা সমগ্র সিরিয়া ও ফিলিস্তিন দখল করে নেয়ার পর বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের ব্যাপক পরিবর্তন করে একে গীর্জায় পরিণত করে। এরপর ১১৮৭ সালে মুসলিম বীর ও সিপাহসালার সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী জেরুজালেম শহর পুনরায় মুসলিমদের অধিকারে নিয়ে আসেন।[৪৯]

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে পবিত্র এই বায়তুল মুকাদ্দাস ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে ইসরাঈলরা দখল করে নেয়। এখন পর্যন্ত তা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

---

৪৯. শাহ মতিন টিপু, *মুসলিমদের প্রথম কেবলা ও অসহায় ফিলিস্তিন*, www.risingbd.com ১০ জুলাই ২০১৫

বায়তুল মুকাদ্দাস

পবিত্র এ মসজিদটি সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর ধরে ইহুদিরা জবরদখল করে রেখেছে। ইহুদিরা সেখানে মুসলিমদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করেছে এবং বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। হাজার বছরের মুসলিম ঐতিহ্যমন্ডিত এই নগরীতে মুসলিমরাই আজ নিগৃহিত। শুধু ফিলিস্ড়িনী মুসলিমদের জন্যেই নয়, বরং সমগ্র মুসলিম জাতির জন্যেই এটি খুবই দুঃখজনক এবং দূর্ভাগ্যজনক।

ইসরাঈলি বাহিনী প্রতিদিনই নিরপরাধ ফিলিস্ড়িনী সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে চলছে। আজ পশ্চিমা বিশ্ব মানবাধিকারের দোহাই তুলে শক্তিশালী ইসরাঈলী বাহিনীর সামনে অসহায় ফিলিস্ড়িনী জনগণের আত্মরক্ষার অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছে।

বায়তুল মুকাদ্দাস দখলের ৪৩ বছরের পূর্তির প্রেক্ষাপটে ২০১০ সালে একটি মানবাধিকার গ্র“প Association for Civil Rights in Israil (ACRI) এক প্রতিবেদন পেশ করে। তাতে বলা হয় পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস শরীফে প্রতি ০৪ জন শিশুর ০৩ জন সহ অধিকাংশ ফিলিস্ড়িনী মুসলিম দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। এখানে ইসরাঈল বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে- বায়তুল মুকাদ্দাস শরীফের কোনো অস্ড়িত্বই নেই।

ACRI আরো বলেছে, পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাসে ৩ লাখ ফিলিস্ড়িনী মাত্র ১০ শতাংশ সামাজিক সেবা পায়। গত চার দশকে ইসরাঈল এক তৃতীয়াংশ ভূমি দখল করে যা ফিলিস্ড়িনীদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিলো। এসব ভূখন্ডে ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ ইহুদিদের জন্যে ৫০ হাজারেরও বেশি বাড়ি ঘর নির্মাণ করে। অথচ গত কয়েক দশকে ফিলিস্ড়িনীদের সেখানে কোনো বাড়ি ঘর নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়নি বললেই চলে।[৫০]

ফিলিস্ড়িনের নির্যাতিত অসহায় জনগণ দীর্ঘদিন ধরে তাদের আবাস ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের জন্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাঈলীদের হাত প্রতিদিনই ফিলিস্ড়িনীদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। আল আকসা মসজিদ, যেখানে দিনে ০৫ বার আজানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হতো তা এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাসের পতন নিঃসন্দেহে মুসলিম বিশ্বের জন্যে চরম বেদনাদায়ক। এটা আমাদের মারাত্মক পরাজয়।

বায়তুল মুকাদ্দাসের সত্তাগত পবিত্রতা আল-াহর পক্ষ থেকে চিহ্নিত করণ, কুর'আনে এ পবিত্রতার উলে-খ, মিরাজের স্মৃতি, প্রথম কিবলা এবং এর পবিত্রতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামগণের সুস্পষ্ট ধারণার ভিত্তিতে ইসলামে এর পবিত্র মর্যাদার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

---

৫০. *www.alihsandesk.com* (১১ মে ২০১০)

কুরআন মজিদে হযরত মুসা (আ.)-এর সময়ে ফিলিস্ড়িন ভূখন্ডকে 'পবিত্র ভূমি' বলে উলে- খ করা হয়েছে। তিনি বনী ইসরাঈলকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের আদেশ দেন, কিন্তু তারা সেখানে প্রবেশে অস্বীকৃতি জানায়।

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ •

"হে আমার কাওম, দাখিল হও পবিত্র ভূমিতে (জের"যালেমে) যা লিখে দিয়েছেন আল- াহ তোমাদের জন্যে, পেছনে হটে যেয়োনা, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়ে পড়বে।"[৫১]

সমগ্র ফিলিস্ড়নই হচ্ছে সেই পবিত্র ভূমি, তবে বায়তুল মুকাদ্দাস বিশেষ পবিত্রতার অধিকারী। সূরা বনী ইসরাঈলেও অধিকতর সুস্পষ্টভাবে এ ভূখন্ডের পবিত্রতা বা বিশেষ মর্যাদার কথা উলে- খ করা হয়েছে।

তাই এখন প্রয়োজন, মহান আল- াহর অনুপম এ নিদর্শন বায়তুল মুকাদ্দাসকে আগের গৌরবে ফিরিয়ে আনা। আর এজন্যেই মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধভাবে কঠোর অবস্থানে দাঁড়াতে হবে। মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও আল- াহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে যে কোনো শক্তির বির"দ্ধে বিজয় অর্জন করা সম্ভব।

---

৫১. আল কুর'আন, ৫:২১

ঐতিহাসিক বায়তুল মুকাদ্দাস

৪র্থ অধ্যায়

ধ্বংসাবশেষের ঐতিহাসিক নিদর্শন

যেসব জাতি দুনিয়াকে শুধুমাত্র ভোগবিলাস ও হাসিখেলার কেন্দ্র মনে করে নবীদের প্রচারিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ভুল মতবাদের ভিত্তিতে জীবন-যাপন করেছে তারা যেসব ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখিন হয়েছে, তা আমরা জানতে পারি মানব জাতির ইতিহাস আলোচনা করে।

মানুষকে হেদায়েত করার জন্যে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এসেছেন। আল-াহ তা'য়ালা প্রত্যেক জাতির কাছে নবী পাঠিয়েছেন। কোনো জাতিকে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ড় শাস্ড়ি দেননি যতক্ষণ না তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন। পূর্বের জাতিগুলোর কাছে বারে বারে নবী পাঠানো হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কোনো জাতির কাছে নবী পাঠানো হয়েছে তখনই সেই জাতির পক্ষ থেকে বিরোধিতা করা হয়েছে। ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে। ফলাফল হলো যারাই নবীর বিরোধিতা করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে, তারা ইতিহাসের আস্ড়াকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।[৫২]

অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ অন্যায়, অবিচার ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছিলো। তাই তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে আল-াহ নবী-রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা নবীদের কথায় কান দেয়নি। ফলে তারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে এবং আল-াহ তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

অতীতে যেসব জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের ধ্বংসের কারণ ছিলো এই যে, আল-াহ তা'য়ালা যখনই তাদেরকে সম্পদ ও প্রতিপত্তি দান করেছেন, তখনই তারা ভোগ বিলাস ও ক্ষমতায় মগ্ন হয়ে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এক সময় সেই সমাজে নৈতিক অধঃপতন এতো বেশি বেড়ে যায় যে, তাদের মধ্যে এমন কোনো সৎ লোকের অস্ড়িত্ব থাকে না যে তাদেরকে অসৎ কাজে বাধা দিবে। অথবা অল্প কিছু সৎ লোক থেকে থাকলেও তারা অন্যদেরকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এজন্যেই আল-াহর অভিশাপ তাদের উপর এসে পড়েছে।

আল-াহ তা'য়ালা অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আল কুর'আনে তাদের উদাহরণ পেশ করেছেন। আল-াহর বিধান না মানার যে ভয়াবহ পরিণাম তা বারবার উলে-খ করা হয়েছে। ইতিহাসের এটাও শিক্ষা যে অতীত জাতি থেকে শিক্ষা না নিয়ে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। ভবিষ্যত জাতিগুলো যাতে

৫২. অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *আল কুর'আনে উদাহরণ* (রাজশাহী: আল ইসলাহ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০০৮), পৃ.-২৮

আল-াহর বিধান মানার ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে সেজন্যেই বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

এ প্রসংগে সূরা আশ শুয়ারাতে ইতিহাসের সাতটি জাতির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব জাতির নবীদের কথায় কান দেয়নি এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার করেছিলো। তাই অবশেষে তারা অধঃপতন ও ধ্বংসেরই যোগ্য হয়েছে।

মানুষের সংস্কার সাধনের জন্যে যেসব নবীগণকে পাঠানো হয়েছিলো তাঁরা সবাই নিজ নিজ জনপদেরই অধিবাসী ছিলেন। হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) তাঁদের জনপদের লোকদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তারা নবীদের সেই দা'ওয়াত গ্রহণ না করে নিজেদের ভিত্তিহীন ধ্যান ধারণা এবং বল্গাহীন প্রবৃত্তির পেছনে ছুটেছে। ফলে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণামের সামনে পড়তে হয়েছে।

পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে অথবা বিভিন্ন কারণে সফর করতে গিয়ে আ'দ, সামূদ, মাদইয়ান, লূতজাতি সহ অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলো অতিক্রম করেছে। তারা সেখানে দেখতে পেয়েছে কি ভয়াবহ পরিণাম এসব জাতি দুনিয়ায় ভোগ করেছে।

সহজেই বোঝা যায়, পরকালে তারা কতো বেশি ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করবে। অপরদিকে যারা নিজেদেরকে দুনিয়ায় সংশোধন করিয়ে নিয়েছে তারা শুধু দুনিয়াই ভালো ছিলো না বরং আখিরাতে তাঁদের অবস্থা আরো বেশি ভালো ও সুখময় হবে।

ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনাগুলো এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, নবীদের মাধ্যমে আল-াহ তা'য়ালা যেসব বিধান পাঠিয়েছেন সে অনুযায়ীই আখিরাতের জবাবদিহি হবে। যে জাতিই এ জবাবদিহিকে মিথ্যা মনে করেছে সে জাতিই অবশেষে ধ্বংসের সম্মুখিন হয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদ

নূহের নৌযান: একটি জ্বলন্ড় নিদর্শন

হযরত আদম (আ.) পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পরে কালক্রমে আদম সন্ড়ানেরা আদম (আ.)-এর শিক্ষা ভুলে যায়। আল-াহ প্রদর্শিত পথ বাদ দিয়ে তাঁরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ভুল পথে চলতে শুর" করে। পূজা করার জন্যে নিজেরাই মূর্তি তৈরি করে এসব দেবদেবীকে তারা আল-াহর অংশীদার বানিয়ে নেয়।

অবশেষে আল-াহ তাঁর চিরাচারিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের হিদায়েতের জন্যে একজন পথ প্রদর্শক পাঠান। তিনি হলেন মহা ধৈর্যশীল নবী নূহ (আ.)। মানব ইতিহাসে যে মহান ব্যক্তি ও তাঁর জাতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানা যায় তিনিই হলেন নূহ (আ.) ও তাঁর জাতি। হযরত আদম (আ.) প্রথম মানব ও প্রথম নবী ও রাসূল হলেও তাঁর জাতি সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে তেমন আলোচনা হয়নি। তাই আদম (আ.) এবং তাঁর জাতি সম্পর্কে আমরা তেমন অবগত হতে পারিনি।

নূহ (আ.) এর পরিচয়:

নূহ (আ.) এর পরিচয় সম্পর্কে স্বয়ং আল-াহ বলেন:

اِنَّهٗ كَانَ عَبۡدًا شَكُوۡرًا •

"নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ বান্দা।"[৫৩]

আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদিস থেকেও নূহ (আ.) এর পরিচয় জানা যায়। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন:

"(হাশরের দিন) নূহ এবং তার উম্মাতেরা (আল-াহর দরবারে) হাযির হবেন। আল-াহ (নূহকে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (যথাযথভাবে আমার পয়গাম) পৌঁছায়েছ? তিনি জবাব দিবেন, হ্যাঁ হে পরওয়ারদিগার! তখন আল-াহ তাঁর উম্মাতকে জিজ্ঞেস করবেন, নূহ কি তোমাদেরকে (আমার পয়গাম) পৌঁছিয়েছে? তারা বলবে- না, আমাদের কাছে কোনো নবীই আসেননি। অতঃপর আল-াহ নূহকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? নূহ বলবেন, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মাত। (রাসূল সা. বলেন) তখন আমরা সাক্ষ্য দেব, নিশ্চয়ই তিনি (আল-াহর পয়গাম) পৌঁছিয়েছেন।"[৫৪]

সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে মুশরিকদের মূর্তি পূজা হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে যাঁকে তাদের কাছে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছিলো তিনিই ছিলেন নূহ (আ.)।

---

৫৩. আল কুর'আন, ১৭:০৩

৫৪. ইমাম বুখারী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৩, পৃ.-৩৩৭, হাদিস নং-৩০৯২

পবিত্র কুর'আনে হযরত নূহ (আ.) এর নামে একটি সূরা রয়েছে। পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে নূহ (আ.) এর নাম উলে- খিত হয়েছে এবং তাঁর সময়কালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

নিেত তাঁর একটি তালিকা উলে- খ করা হলো:[৫৫]

ক্রম. নং	সূরার নাম্বার	সূরার নাম	আয়াত নং
০১.	৩	সূরা আল ইমরান	৩৩
০২.	৪	সূরা আন নিসা	১৬৩
০৩.	৬	সূরা আল আন'আম	৮৪
০৪.	৭	সূরা আল আরাফ	৫৯, ৬৯
০৫.	৯	সূরা আত্ তাওবা	৭০
০৬.	১০	সূরা ইউনুস	৭১
০৭.	১১	সূরা হুদ	২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯
০৮.	১৪	সূরা ইবরাহিম	৭
০৯.	১৭	সূরা বনি ইসরাঈল	৩, ১৭
১০.	১৯	সূরা মারইয়াম	৫৮
১১.	২১	সূরা আল আম্বিয়া	৭৬
১২.	২২	সূরা আল হাজ্জ	৪২
১৩.	২৩	সূরা আল মু'মিনুন	২৩
১৪.	২৫	সূরা আল ফুরকান	৩৭
১৫.	২৬	সূরা আশ্ শু'আরা	১০৫, ১০৬, ১১৬
১৬.	২৯	সূরা আল আনকাবুত	১৪
১৭.	৩৩	সূরা আল আহযাব	৭
১৮.	৩৭	সূরা আস সাফফাত	৭৫, ৭৯
১৯.	৩৮	সূরা সোয়াদ	১২
২০.	৪০	সূরা মু'মিন	৫, ৩১
২১.	৪২	সূরা আশ্ শূরা	১৩
২২.	৫০	সূরা কাফ	১২
২৩.	৫১	সূরা আয্ যারিয়াত	৪৬

৫৫. মাওলানা হিফযুর রহমান- *কাসাসুল কুর'আন* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, আগস্ট-১৯৯০), পৃষ্ঠা-৫৪

নূহ (আ.) এর জাতির পরিচয়ঃ

কুর'আন এবং বাইবেলের বিবরণ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে হযরত নূহের জাতি যে দেশে বাস করতো তা আজ ইরাক নামে পরিচিত। ব্যবিলনের প্রাচীন নিদর্শনাবলীতে বাইবেল পূর্ব যে সব প্রচীন শিলালিপি ও প্রস্ড়র ফলক পাওয়া গেছে সে সব থেকেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।[৫৬]

নূহ (আ.)-এর কাওম বাস করতো আধুনিক ইরাক, তুর্কী ও ইরানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আর্মেনিয়ার আরারাত পর্বতমালার উপত্যাকা অঞ্চলে।[৫৭]

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا •

"আর নূহের কাওমকেও, যখন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো রাসূলদের, তখন আমরা তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আর তাদের বানিয়ে দিয়েছিলাম মানবজাতির জন্যে একটি নিদর্শন। আর আমরা যালিমদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।"[৫৮]

হযরত নূহ (আ.)-এর কাওম ভারতীয় ব্রাহ্মণদের ন্যায় আল-াহর তরফ থেকে নবী-রাসূল প্রেরণের সম্ভাব্যতাই অস্বীকার করেছিলো। অর্থাৎ এরা বলতো, আল-াহ তা'য়ালা মানুষের মধ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেন, এ কথাটি অলীক। যার পরিণতিতে তারা ডুবে মরেছে এবং মানব ইতিহাসে নূহ (আ.) এর আমলের মহাপ-াবন একটা চিরস্থায়ী শিক্ষণীয় ঘটনা হয়ে রয়েছে।[৫৯]

হযরত নূহ (আ.) এর জাতির নৈতিক অধঃপতনঃ

হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর জাতির যে অবস্থা কুর'আনে বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, নূহের জাতি আল-াহর অস্ড়িত্ব অস্বীকার করতো না এবং আল-াহর ইবাদত করতেও তাদের আপত্তি ছিলো না। কিন্তু তারা লিপ্ত ছিলো শিরকের গুমরাহিতে। অর্থাৎ তারা অন্যান্য সত্তাকে আল-াহর অংশীদার মনে করতো এবং তাদেরও ইবাদত পাবার অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করতো।

---

৫৬. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, *সীরাতে সরওয়ারে আলম* (ঢাকাঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমি, এপ্রিল-১৯৮৮), পৃষ্ঠা-০৫

৫৭. আলহাজ্ব অধ্যাপক গোলাম ছোবহান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২১

৫৮. আল কুর'আন, ২৫:৩৭

৫৯. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *কুর'আন ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ* (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- আগষ্ট ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৯৩-২৯৪

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা অনুযায়ী নূহ (আ.) এর জাতির মধ্যে মূর্তিপূজার সূচনা হয় এভাবে যে, ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর নামে কতিপয় নেক বান্দা ছিলেন। তাঁদের ইন্তিকালের পর লোকেরা তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে যাতে তা দেখে উল্লেখিত বুযুর্গগণের ইবাদত-বন্দেগির অবস্থা স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকে। কিছুকাল পার হওয়ার পর তারা সে প্রতিকৃতি অনুযায়ী মূর্তি তৈরি করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তা পূজা-অর্চনায় গড়ায়।[৬০]

চিন্তার বিভ্রান্তি, নৈতিক অধঃপতন এবং অর্থনৈতিক শোষণ নূহ আ.-এর কাওমের সাধারণ মানুষের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলো। তারা ছিলো অধিকার হারা। অজ্ঞতা আর কুসংস্কার ছিলো তাদের নিত্য সঙ্গী। জীবন মিশন সম্পর্কে তাদের ছিলো না কোনো ধারণা। পশু জীবন আর মানব জীবনের মধ্যে ছিলো না বড় রকমের কোনো পার্থক্য।[৬১]

সমাজপতিরা ছিলো সাধারণ মানুষের রব। সমাজপতিদের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হতো তাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ।[৬২]

সে সময়ে জনগণকে শাসন-শোষণ করতো এসব সর্দার-সমাজপতিরাই। মানুষের রুজি-রোজগারের চাবিকাঠিও তাদের হাতে ছিলো। বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকও তারা ছিলো। তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন ছিলো। তাদের দাপটে কেউ নবীর দা'ওয়াত গ্রহণের সাহস করতো না। করলে তাদের ওপর নানা যুল্‌ম উৎপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। কতিপয় উৎপীড়িত মযলুম মানুষ- সংখ্যায় অতি নগণ্য- হযরত নূহ (আ.) এর দা'ওয়াত কবুল করেছিলো। সমাজপতিরা এদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতো।[৬৩]

আতা (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বলেছেন: যে সব দেব-দেবীর পূজা নূহ (আ.) এর সম্প্রদায় করতো সেগুলোই পরবর্তীকালে আরবদের পূজ্য দেবতায় পরিণত হয়।[৬৪]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দিরও বর্তমান ছিলো।

নূহের জাতির মধ্যে যেসব দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিলো সেগুলো হলো:

---

৬০. শাব্বির আহমদ উসমানি (র.): *তাফসিরে উসমানি*, অনুবাদ: হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ (ঢাকা: আল কুর'আন একাডেমি, প্রকাশকাল- জানুয়ারি ১৯৯৬), খন্ড-২, পৃ.-৬০

৬১. এ.কে.এম. নাজির আহমেদ, *দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার প্রকাশকাল-), পৃ.-৭৯

৬২. প্রাগুক্ত

৬৩. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৯১), পৃ.-১৫

৬৪. প্রাগুক্ত

◆ **ওয়াদ্দঃ** ওয়াদ্দ ছিলো 'কুদা'আ গোত্রের 'বনী কালব ইবনে দাবরা' শাখার উপাস্য দেবতা। 'দুমাতুল জানদাল' নামক স্থানে তারা এর বেদী নির্মাণ করে রেখেছিলো। কালবীর মতে তার মূর্তি ছিলো এক বিশালদেহী পুর ুষের আকৃতিতে নির্মিত।

◆ **সুওয়াঃ** সুওয়া ছিলো হুযাইল গোত্রের দেবী। তার মূর্তি ছিলো নারীর আকৃতিতে তৈরি। ইয়াম্বুর সন্নিকটস্থ 'র ুহাত' নামক স্থানে তার মন্দির ছিলো।

◆ **ইয়াগুসঃ** ইয়াগুস ছিলো 'তায়' গোত্রের 'আনউম' শাখার এবং 'মাযহিজ' গোত্রের কোনো কোনো শাখার উপাস্য দেবতা। 'মাযহিজে'র শাখা গোত্রের লোকেরা ইয়ামান ও হিজাযের মধ্যবর্তী 'জুরাশ' নামক স্থানে তার সিংহাকৃতির মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিলো।

◆ **ইয়াউক:** 'ইয়াউক' ইয়ামানের হামদান অঞ্চলের অধিবাসী হামদান গোত্রের 'খাওয়ান' শাখার উপাস্য দেবতা ছিলো। এর মূর্তি ছিলো ঘোড়ার আকৃতির।

◆ **নাসরঃ** 'নাসর' ছিলো হিযইয়ার অঞ্চলের হিযইয়ার গোত্রের 'আলে যুল-কুলা' শাখার দেবতা। 'বালখা' নামক স্থানে তার মূর্তি ছিলো। এ মূর্তির আকৃতি ছিলো শকুনের মতো। সাবার প্রাচীন শিলালিপিতে এর নাম উলে- খিত হয়েছে 'নাসূর'।[৬৫]

হযরত নূহ (আ.) এর দা'ওয়াতঃ

এই অজ্ঞ জাতিকে সঠিক আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্যে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দা নূহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন। আল- াহ বলেনঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ •

"আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কাওমের কাছে (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমার কাওমকে সতর্ক করো তাদের প্রতি বেদনাদায়ক আযাব আসার আগেই।"[৬৬]

আল- াহর নির্দেশ মুতাবিক নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে বললেনঃ

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ • أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ • يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ •

---

৬৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৬৪

৬৬. আল কুর'আন, ৭১:০১

“তিনি (তাদের) বলেছিলেন: হে আমার কাওম! আমি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী! তোমরা এক আল-াহ্র ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো (তাঁর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হও) আর আমার আনুগত্য করো। তাহলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপসমূহ এবং তোমাদের অবকাশ দেবেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড়। জেনে রাখো, আল-াহ্র নির্ধারিত সময় এসে পড়লে তা আর দেরি করা হয় না, যদি তোমরা জানতে!”৬৭

হযরত নূহ (আ.) তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের শুর"তেই তাঁর জাতির সামনে তিনটি বিষয় পেশ করেছিলেন। এক. আল-াহর দাসত্ব, দুই. তাকওয়া বা আল-াহভীতি এবং তিন. রাসূলের আনুগত্য। আল-াহর দাসত্ব মানে অন্য সব কিছুর দাসত্ব ও গোলামি বর্জন করে এক আল-াহকেই শুধু উপাস্য মেনে নিয়ে কেবল তাঁরই উপাসনা করা এবং তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। তাকওয়া মানে এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা আল-াহর অসন্তুষ্টি ও গযবের কারণ হয়। আর রাসূলের আনুগত্য হলো আল-াহর রাসূল হিসেবে তিনি যেসব আদেশ দেবেন তা মেনে চলা।

নূহ (আ.) আল-াহর নির্দেশ অনুযায়ী আরো জানিয়ে দেন:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ • فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُونِ • وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ •

“আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ড় রাসূল। অতএব, তোমরা আল-াহ্কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। তোমাদের (সতর্ক করার) এ কাজ করার জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমাকে প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের।”৬৮

মহান রাব্বুল আলামিন নূহ (আ.) এর জাতি সম্পর্কে বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ • أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّـهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ •

“আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তাঁর কাওমের কাছে। (সে তাদের বলেছিল): আমি তোমাদের প্রতি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তোমরা আল-াহ্ ছাড়া আর কারো

---

৬৭. আল কুর’আন, ৭১:০২-০৪
৬৮. আল কুর’আন, ২৬:১০৭-১০৯

ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক বেদনাদায়ক দিনের আযাবের আশংকা করছি।”[৬৯]

নূহ (আ.) প্রত্যেক ব্যক্তির ঘরে পৌঁছে তার সামনে ইসলামের মর্মবানী উপস্থাপন করেন। আবার জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে জনগণের সামনেও তিনি পেশ করেন তাঁর বক্তব্য। নূহ (আ.) নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ কাজ করে চলেছিলেন। রাতভর দিনভর তিনি এ প্রয়াস চালাতে থাকেন। সাড়ে নয়শত বছর তিনি নিয়োজিত থাকেন দাওয়াতি কাজে। অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন।[৭০]

নূহের জাতি সম্পর্কে মহান আল-াহ বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ • فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ •

“আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কাওমের কাছে। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর। অবশেষে তাদের পাকড়াও করে তুফান (প-াবন), কারণ তারা ছিলো যালিম। তারপর আমরা নাজাত দিয়েছিলাম তাকে (নূহকে) এবং নৌযানে আরোহীদেরকে আর এ ঘটনাকে করে দিয়েছি জগতবাসীর জন্যে একটি নিদর্শন।”[৭১]

নবুওয়্যাতের দায়িত্ব লাভ করার পর থেকে মহাপ-াবন পর্যন্ড় সাড়ে ন'শো বছর নূহ (আ.) এ যালিম ও গোমরাহ জাতির সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন এবং এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ড় তাদের যুল্‌ম নির্যাতন বরদাশ্‌ত করার পরও তিনি হিম্মত হারা হননি। দিবসে, রজনীতে, প্রকাশ্যেত ও গোপনে তিনি তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করে। অবশেষে প-াবনের আকারে তাদের ওপর আল-াহর গযব পতিত হয়। ফলে তারা সমূলে বিনাশ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৭২]

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নূহ (আ.) চলি-শ বছর বয়সে নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন এবং মহাপ-াবনের পর আরও ষাট বছর জীবিত ছিলেন। পক্ষান্ড়রে মামুকাতিল (র.)

৬৯. আল কুর'আন, ১১:২৫-২৬
৭০. এ.কে.এম. নাজির আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৮০
৭১. আল কুর'আন, ২৯:১৪-১৫
৭২. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-১৫, পৃ.-৫৬০

বলেন, তিনি একশ বছর বয়সে নবুওয়্যাত লাভ করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো পঞ্চাশ বছর।[৭৩]

অধিকাংশ ব্যক্তিই নূহ (আ.) এর ডাকে সাড়া দেয়নি। তাঁর হাজারো মর্মস্পর্শী আবেদনের পরও তারা তাঁর কোনো কথাই শুনলো না। বরং তারা তাঁর এ সত্য আহ্বানের জবাব দেয় তিরস্কার ও বিরোধিতার মাধ্যমে। এমনকি তারা আল-াহর নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ড় করে। আল-াহ বলেন:

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا •

"তারা বিরাট প্রতারণার জাল বিস্ড়ার করে রেখেছিলো।"[৭৪]

প্রতারণা হলো ঐসব নেতৃবৃন্দের কলাকৌশল যা দ্বারা তারা জনসাধারণকে হযরত নূহ (আ.) এর শিক্ষার বির"দ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করতো। তাদের প্রতারণার কিছু উদাহরণ কুর'আনে এসেছে:

فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا •

"তখন তার কাওমের প্রধানরা বলেছিলো: 'আমরা তো তোমাকে আমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।"[৭৫]

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ •

"আর আমরা বাহ্য দৃষ্টিতেই দেখছি, যারা তোমার অনুসরণ করছে তারা আমাদের মধ্যে একেবারেই নীচু শ্রেণীর।"[৭৬]

وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً •

"আল-াহর কোনো নবী রাসূল পাঠাবার দরকার হলে, তিনি কোনো ফেরেশতাকেই পাঠাতেন।"[৭৭]

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّـهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ

---

৭৩. কাযী ছানাউল-াহ পানিপথী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-১২, পৃ.-৪৪১
৭৪. আল কুর'আন, ৭১:২২
৭৫. আল কুর'আন, ০৭:৬৩, ১১:২৭
৭৬. আল কুরআন, ১১:২৭
৭৭. আল কুর'আন, ২৩:২৪

اللَّـهُ خَيْرًا ۖ اللَّـهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ •

"আমি তো তোমাদের বলছি না যে, আমার কাছে আল-াহ্র অর্থভা ার রয়েছে, কিংবা আমি গায়েব জানি। কিংবা আমি তো এ কথাও বলছি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা নিম্নশ্রেণীর তাদের ব্যাপারেও আমি একথা বলি না যে, আল-াহ্ কখনো তাদের কল্যাণ করবেন না। তাদের অন্ড়রে যা আছে আল-াহ্ই তা অধিক জানেন। তোমাদের কথা মেনে নিলে তো আমি যালিমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবো।"[৭৮]

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَـٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ •

"তখন তার কাওমের কাফির নেতারা বলেছিল: এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেতে চায়। আল-াহ্ (রাসূল পাঠাতে) চাইলে অবশ্যি ফেরেশ্তা পাঠাতেন। আমাদের আগেকার লোকদের সময় এ রকম ঘটনা ঘটেছে বলে তো আমরা শুনিনি।"[৭৯]

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ •

"সে আসলে একজন জিনে ধরা লোক। তোমরা এ ব্যাপারে কিছুদিন অপেক্ষা করো।"[৮০]

হযরত নূহ (আ.) এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে দীর্ঘকাল ধরে ধৈর্য্য ও হিকমতের সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা জনসাধারণকে প্রতারণার জালে এমনভাবে ফাঁসিয়ে রেখেছিলো যে, নূহ (আ.)-এর দাওয়াতের কোনো চেষ্টাই কাজে আসলো না। অবশেষে নূহ (আ.) আল-াহর কাছে দোয়া করলেন:

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا •

"আমার রব! তুমি ক্ষমা করে দাও আমাকে, আমার বাবা-মাকে আর মুমিন হয়ে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করবে তাদেরকে এবং সব মুমিন পুর ষ ও নারীকে। যালিমদের তুমি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বাড়িয়ে দিয়ো না।"[৮১]

---

৭৮. আল কুর'আন, ১১:৩১
৭৯. আল কুর'আন, ২৩:২৪
৮০. আল কুর'আন, ২৩:২৫
৮১. আল কুর'আন, ৭১:২৮

আল-াহর কাছে করা নূহ (আ.) এ দোয়ায় তাঁর নিজের ও ঈমানদারদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থণা করেছেন। আর তাঁর নিজ কাওমের কাফেরদের জন্যে আল-াহর কাছে আবেদন করেছেন যেন তাদের কাউকেই পৃথিবীর বুকে বসবাসের জন্যে জীবিত রাখা না হয়। তাঁর এ বদদোয়া কোনো প্রকার ধৈর্যহীনতার কারণে ছিলো না। বরং এ বদদোয়া তাঁর মুখ থেকে তখনই উচ্চারিত হয়েছিলো যখন তিনি তাঁর জাতির ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। শত শত বছর দা'ওয়াত দেয়ার পরও তারা সঠিক পথে আসেনি। সুতরাং তাদের মধ্যে আর কোনো কল্যাণই অবশিষ্ট ছিলো না।

সুদীর্ঘকালব্যাপী উপদেশ দান করা সত্ত্বেও যখন দেখা গেলো যে, তেমন কোনো ফল হচ্ছে না, অর্থাৎ সামান্য সংখ্যক লোক ছাড়া আর কেউ আল-াহর দীন গ্রহণ করছে না।

সে সময় মহান রাব্বুল আলামিনও জানিয়ে দিলেন:

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ •

"নূহকে অহির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, তোমার কাওমের যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউই ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের কর্মকাে রর কারণে তুমি আর নিরাশ হয়ো না।"[৮২]

আল-াহ আরো বলেন:

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ • وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ •

"স্মরণ করো, এর আগে নূহ (আমাকে) ডেকেছিল। আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে আর তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে। আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম এমন একটি কাওমের বির ুদ্ধে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত। তারা ছিলো একটি মন্দ কাওম, ফলে আমরা তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম পানিতে।"[৮৩]

---

৮২. আল কুর'আন, ১১:৩৬

৮৩. আল কুর'আন, ২১:৭৬-৭৭

নৌযান নির্মাণ:

আল্লাহর এই মহান নবী নূহ (আ.) সাড়ে নয়শ বছর ধরে তাঁর জাতিকে সত্য পথে আনার অবিরাম চেষ্টা করেন। তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর হাজারো মর্মস্পর্শী আবেদনের পরও তারা তাঁর কোনো কথা শুনলো না। বরং তারা তাঁর এই মহৎ আহ্বানের জবাব দেয় তিরস্কার ও বিরোধিতার মাধ্যমে। এমনকি তারা আল্লাহর নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করে। পৃথিবীর জন্যে আল্লাহর নিয়ম হলো, কোনো বিপথগামী জাতি সকল চেষ্টার পরও যখন সত্য পথে আসে না, তখন তিনি তাদের ধ্বংস করে দেন। নূহ (আ.) এর জাতির ক্ষেত্রেও আল্লাহর এ নিয়মটিই প্রযোজ্য হয়েছিলো। আল্লাহ এ জাতিকে পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে দেয়ার ফায়সালা করেন।

আল্লাহ নূহ (আ.)-কে নির্দেশ দেন:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ •

"একটি নৌযান তৈরি করো।"[৮৪]

হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী নৌযান তৈরি করা শুরু করলেন নদী থেকে অনেক দূরে শুষ্ক ভূমিতে। তাঁর জাতির কর্তাব্যক্তিরা কেউ কেউ এ পথে যাবার সময় নৌযান তৈরির কাজ দেখে বিদ্রূপ করতো। তাদের কাছে এটা একটা পাগলামিই মনে হতো। কিন্তু এ দূর্ভাগার দল আন্দাজ করতে পারেনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শক্তিমত্তার অসীমতা। তাদের মনের বক্রতা তাদেরকে বুঝতে দেয়নি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্থলভাগেও মহাপ্লাবন সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন।[৮৫]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ •

"আমাদের তত্ত্বাবধান ও অহির ভিত্তিতে তুমি একটি নৌযান তৈরি করো এবং যারা যুল্‌ম করেছে তাদের বিষয়ে তুমি আমার কাছে কোনো প্রকার সুপারিশ করো না, তারা পানিতে নিমজ্জিত হবেই।"[৮৬]

নূহ (আ.) যখন নৌযান নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কাওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতো- আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন যে 'খুব শীঘ্রই এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌযান তৈরি করছি।'

---

৮৪. আল কুর'আন, ১১:৩৭
৮৫. এ.কে.এম. নাজির আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৮০-৮৩
৮৬. আল কুর'আন, ১১:৩৭

তখন তারা বলতো- 'এখানে তো পান করার মতো পানিও দূর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।'[৮৭]

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ •

"অবশেষে এসে পড়ে আমাদের নির্দেশ এবং চুলা থেকে উথলে উঠতে থাকে পানির স্রোত। আমরা বললাম, তাতে উঠিয়ে নাও সব শ্রেণীর যুগলের দুইটি করে আর তোমার পরিবার পরিজনকে আর যারা ঈমান এনেছে, তবে তাদেরকে নয় যাদের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ড় হয়ে গেছে। আর তার (নূহের) সাথে ঈমান এনেছিল মাত্র কয়েকজনই।"[৮৮]

অবশেষে নূহ (আ.) এর নৌযান তৈরি হয়ে গেলো। নূহ (আ.) নৌযান তৈরি করে আল-াহর নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকেন। নির্দেশ আসার সাথে সাথে তিনি নৌযানে তুলে নিলেন সমস্ড় ঈমানদার লোকদের, সব রকমের জীবজন্তু থেকে এক এক জোড়া। নূহ (আ.) এর এক স্ত্রী ও পুত্র ঈমান না আনার কারণে তারা ছাড়া পরিবারের অন্য সবাইকেও নৌযানে তুলে নিলেন। আকাশ থেকে পানি বর্ষণ শুর" হলো আর ভূগর্ভ থেকে পানি উপরে উঠতে শুর" করলো। আর সেসময় নূহ (আ.) এর নৌযান আল-াহর হেফাযতে পানির উপর ভাসতে থাকলো যতক্ষণ পর্যন্ড় না অবিশ্বাসী ও অবাধ্য লোকেরা পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়ে গেলো।

কাতাদা (র.) বলেন, নূহের নৌযানটির দৈর্ঘ্য ছিলো তিনশ' হাত। আবদুল-াহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, দৈর্ঘ্য ছিলো বারশ' হাত এবং প্রস্থ ছিলো ছ'শ হাত।[৮৯]

কোনো কোনো ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌযানটি ৩০০ গজ দীর্ঘ, ৫০ গজ প্রস্থ, ৩০ গজ উঁচু ও ত্রিতল বিশিষ্ট ছিলো। এর দুই পাশে অনেকগুলো জানালা ছিলো।[৯০]

নৌযানটির ভিতরের উচ্চতা ছিলো ত্রিশ হাত। তাতে তিনটি তলা ছিলো। প্রত্যেকটি তলা ছিলো দশ হাত করে উঁচু। নীচের তলায় ছিলো চতুষ্পদ জন্তু ও বন্য জানোয়ার।

---

৮৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন*, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- নভেম্বর ১৯৮৮), খন্ড-০৪, পৃ.-৬০৬

৮৮. আল কুরআন, ১১:৪০

৮৯. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসির (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-১২, পৃ.-৫৬

৯০. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-৪, পৃ.-৬০৫

মধ্য তলায় ছিলো মানুষ। আর উপরের তলায় ছিলো পাখি। দরজা ছিলো প্রশস্ড় এবং উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিলো।[৯১]

নূহ (আ.) এর পুত্রের পরিণতি:

নূহ (আ.) এর কাফির পুত্রের পরিণতি দেখে এটাই বোঝা যায়, আল-াহর কাছে মুক্তির ওয়াদা ও বংশের ভিত্তিতে হয় না বরং তা আল-াহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে হয়।

পুরোপুরি প-াবণ যখন শুর“ হয়ে গিয়েছে তখন চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার হয়ে ঝড় বৃষ্টি শুর“ হলো। মনে হলো যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে। সবকিছু পানিতে থৈ থৈ করতে লাগলো। অসংখ্য কাফের তখন পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে।[৯২]

পানির উপর যখন ভাসতে শুর“ করলো নৌযানটি, অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিলো নূহ (আ.)-এর কাফির পুত্র কেনআন। নূহ (আ.) চিৎকার করে ছেলেকে ডেকে বললেন:

يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ •

"হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফিরদের সাথি হয়ে থেকে যেয়ো না।"[৯৩]

قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ •

"কিন্তু সে বলেছিলো: 'আমি (উঁচু) পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমাকে পানি (প-াবন) থেকে রক্ষা করবে।' তিনি (নূহ) বললেন: 'আজ আল-াহ্‌র ফায়সালা থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে তিনি যাকে দয়া করেন সে ছাড়া। (বলতে বলতে) তরঙ্গ তাদের মাঝখানে ঢুকে গেলো এবং সে ডুবে যাওয়াদের অন্ড়র্ভুক্ত হয়ে গেলো।"[৯৪]

ঈমানের পথে না চলার পরিণতি ভয়াবহ! নবীর ছেলে হয়েও আল-াহর পাকড়াও থেকে রেহাই পেলোনা সে।

মহাপ-াবনে নূহ (আ.) এর জাতির পরিণতি:

---

৯১. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসির (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-১২, পৃ.-৫৬

৯২. আবুল হোসাইন মাহমুদ, *আল কুর'আনের কাহিনী* (ঢাকা: আর. আই. এস. পাবলিকেশন্স, প্রকাশ কাল-নভেম্বর ১৯৯৬), পৃ.-৭৭

৯৩. আল কুর'আন, ১১:৪২

৯৪. আল কুর'আন, ১১:৪৩

দীর্ঘকাল দা'ওয়াত দানের পরও যখন উলে- খযোগ্য সংখ্যক লোক নূহ (আ.) এর আহ্বান প্রত্যাখান করলো তখন তিনি আল-াহর দরবারে দু'আ করলেন:

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ • فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ •

"তাদের আগে নূহের জাতিও প্রত্যাখ্যান করেছিল (তাদের রাসূলকে), তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের দাসকে এবং বলেছিল: 'এ এক তিরস্কৃত ও ধমক খাওয়া পাগল। তখন তিনি তাঁর রবের কাছে দোয়া করে বলেছিলেন: আমি পরাস্ড় হয়েছি, আমাকে সাহায্য করো।"[৯৫]

তাদের সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামিন বলেছেন:

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ •

"কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আমরা তাকে আর তার সাথে যারা নৌযানে উঠেছিল তাদেরকে নাজাত দেই, আর ডুবিয়ে দেই তাদেরকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত। মূলত, তারা ছিলো একটি অন্ধ কাওম।"[৯৬]

মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী আকাশের পানি ও মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত পানি এক সাথে মিলিয়ে দিয়ে তুফান ও মহাপ- াবন দিয়ে হযরত নূহ (আ.) -এর জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ • وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ •

"ফলে আমরা প্রবল পানি বর্ষণের জন্যে খুলে দিয়েছিলাম আসমানের দুয়ার। এবং যমিন থেকে উৎসারিত করে দিয়েছিলাম বিপুল প্রস্রবন। তারপর সব পানি মিলে গেলো এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক।"[৯৭]

আল- াহ তা'য়ালা ঐ কাফির কওমের ওপর তুফান পাঠালেন। আকাশ হতে মুষুলধারের বৃষ্টির দরজা খুলে দিলেন এবং যমিন হতে উথলিয়ে ওঠা পানির প্রস্রবনের মুখ খুলে দিলেন। চতুর্দিকে পানিতে ভরে গেলো। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হলো না এবং যমিন হতে পানি ওঠাও বন্ধ হলো না। নির্ধারিত সময় পর্যন্ড় এটাই চলতেই থাকলো।[৯৮]

---

৯৫. আল কুর'আন, ৫৪:১০
৯৬. আল কুর'আন, ০৭:৬৪
৯৭. আল কুর'আন, ৫৪:১১-১২
৯৮. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্ন কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-১৭, পৃ.-১৮৬

কুর'আনের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, প-াবনের সূচনা হয়েছিলো একটি বিশেষ চুলা থেকে যার নিচ থেকে পানির ঝর্ণা উৎক্ষিপ্ত হয়।

'তান্নূর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ চুলা বা টীলা। এখানে 'তান্নূর' উপচে পড়া' অর্থে প্রত্যেক বাড়ির চুলা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাড়ির চুলা উপচে পানি বের হতে শুর— হয়েছিলো এবং এভাবেই হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ—াবন শুর— হয়েছিলো। আবুশ শায়খ হযরত ইকরামা এবং যুহরীর উক্তি উদ্বৃত করে বলেছেন যে, এখানে 'তান্নূর' শব্দ দ্বারা বিশেষ কোনো চুলা বুঝানো হয়নি, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠেরই স্থানে স্থানে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিলো এবং পানি উঠতে শুর— করেছিলো। হযরত আলী (রা.)-এর একটি কাওল উদ্বৃত করে ইবনে আবী হাতেম বলেন, কুফার ঐতিহাসিক মসজিদ প্রাঙ্গণে এখনও যে রহস্যজনক চুলাটি দেখতে পাওয়া যায়, এটিই সেই ঐতিহাসিক চুলা যার তলদেশ থেকে সর্বপ্রথম পানি উথলে উঠতে শুর— করেছিলো। হযরত আলী (রা.) আরো বলেন, এমনও বর্ণনা রয়েছে যে, কুফার মসজিদ প্রাঙ্গণে যে দর্শনীয় চুলাটি রয়েছে, সেটি আমাদের মা হযরত হাওয়া কর্তৃক নির্মিত এবং এটাতে তিনি র—টি তৈরি করতেন। হযরত নূহ আলাহিস সালাম এটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

মুজাহিদ ও শা'বী বলেছেন, চুলাটি ছিলো কুফা নগরীর প্রান্ড়দেশে। শা'বী শপথ করে বলেছেন, কুফা নগরীর এক পাশে অবস্থিত ঐ চুলা থেকেই উদগত হয়েছিলো পানির প্রস্রবণ। এখন কুফা মসজিদ যেখানে, সেখানেই হযরত নূহ (আ.) নির্মাণ করেছিলেন তাঁর নৌযান। চুলাটি ছিলো বাবে কুন্দার প্রবেশ পথের দক্ষিণ প্রান্ড়ে। ঐ চুলা থেকে পানি উদগিরিত হওয়াই ছিলো প-াবন শুর—র আলামত।[৯৯]

অতঃপর নূহ (আ.) এর জাতির পরিণতির কথা আল-াহ রাব্বুল আলামিন নিজেই জানিয়ে দিচ্ছেন।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ •

"আরো আগে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম নূহের জাতিকেও। তারা ছিলো এক ফাসিক (সীমালংঘনকারী সত্যত্যাগী) জাতি।"[১০০]

নূহ (আ.) এর জাতির অবাধ্য লোকেরা তাদের নিজেদের অপরাধের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেলো। শুধু এ দুনিয়ার ধ্বংসেই তারা শেষ হয়নি বরং এ ধ্বংসের পরপরই তাদের রূহসমূহকে আগুনের কঠিন শাস্ড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। যা মহান আল-াহর নিতোক্ত ঘোষণা থেকে বোঝা যায়:

৯৯. কাযী ছানাউল—াহ পানিপথী (রহ:), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৬, পৃ.-৫৪
১০০. আল কুর'আন, ৫১:৪৬

مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّـهِ أَنصَارًا •

"তাদের অপরাধের জন্যে তাদের ডুবিয়ে দেয়া হলো পানিতে, অতঃপর তাদের দাখিল করা হলো জাহান্নামে। তারা আল-াহকে ছাড়া আর কাউকে সাহায্যকারী পাবে না।"[১০১]

মহাপ-াবনে ঈমানদারদের অবস্থা:

স্বল্পসংখ্যক লোক যাঁরা নূহ (আ.) এর দা'ওয়াত গ্রহণ করলো, তাঁদেরকে আল-াহ রাব্বুল আলামিন তাঁর অনুগ্রহে সিক্ত করলেন। তাঁরা আল-াহর প্রেরিত সেই মহাপ-াবনে ক্ষতির সম্মুখিন হয়নি।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ • تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ •

"তখন আমরা নূহকে আরোহণ করিয়ে নিয়েছিলাম পাত ও পেরেক দিয়ে তৈরি করা নৌযানে। সেটি চলছিল আমাদের তত্ত্বাবধানে, যারা কুফুরি করেছিল, তাদের প্রতিফল দেয়ার জন্যে।"[১০২]

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ • ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ •

"তখন আমি তাকে এবং তার সাথিদেরকে নৌযানে বোঝাই করে রক্ষা করেছি, আর বাকি সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি পানিতে।"[১০৩]

জাহাজে আরোহণকারীদের সংখ্যা কুর'আনে ও হাদিসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উলে-খ করা হয়নি। তবে আবদুল-াহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিলো ৮০ জন। যাদের মধ্যে নূহ (আ.) এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস ও তাদের তিন জন স্ত্রীও ছিলো। নূহ (আ.) এর চতুর্থ পুত্র কেনআন কাফিরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছে।[১০৪]

মহাপ-াবনের সময় ঈমানদারদের অবস্থা কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে ফুটে উঠেছে। সঠিক পথে থাকার কারণে আল-াহ তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন।

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ •

---

১০১. আল কুর'আন, ৭১:২৫
১০২. আল কুর'আন, ৫৪:১৩-১৪
১০৩. আল কুর'আন, ২৬:১১৯-১২০
১০৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৪, পৃ.-৬০৮

"(এর আগে নূহের সময়) পানি যখন উথলে উঠেছিল আমরা তোমাদের তুলে নিয়েছিলাম নৌযানে।"[১০৫]

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ •

"কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আমরা তাকে আর তার সাথে যারা নৌযানে উঠেছিল তাদেরকে নাযাত দেই, আর ডুবিয়ে দেই তাদেরকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত। মূলত, তারা ছিলো একটি অন্ধ কাওম।"[১০৬]

এভাবেই সেই মহাপ-াবনের সময় আল-াহর অনুগ্রহ পেয়েছিলো ঈমানদার লোকেরা আর ডুবে মরেছিলো ভ্রান্ড় পথের লোকেরা।

মহাপ-াবন কি বিশ্ব জুড়ে ছিলোঃ

নূহ (আ.) এর সময়ের এ প-াবন কতোটুকু অঞ্চল জুড়ে হয়েছিলো তা আজো জানা যায়নি। এ প-াবন কি সারা বিশ্ব জুড়ে ছিলো, না শুধু নূহ (আ.) এর জাতির বসবাসের অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিলো- এ নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। ইসরাইলি বর্ণনা মতে, 'এ প-াবন সারা পৃথিবী জুড়েই হয়েছিলো।'[১০৭]

কিন্তু কুর'আনের কোথাও এ কথা বলা হয়নি। কুর'আনের ইংগিতসমূহ থেকে অবশ্য এ কথা জানা যায় যে, নূহের প-াবন থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিলো পরবর্তী মানব বংশ তাদেরই সন্ড়ান। কিন্তু এ থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, প-াবন সারা দুনিয়া জুড়ে এসেছিলো। কেননা একথা এভাবেও সত্য হতে পারে যে, সে সময় দুনিয়ার যে অংশ জুড়ে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিলো প-াবন সে অংশেই সীমাবদ্ধ ছিলো। আর প-াবনের পরে মানুষের যে বংশধারার উন্মেষ ঘটেছিলো তারাই ধীরে ধীরে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। দু'টি জিনিস থেকে এ মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

এক. ঐতিহাসিক বিবরণ, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও মৃত্তিকাস্ড়রের ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দাজলা ও ফোরাত বিধৌত এলাকায় একটি মহাপ-াবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সারা দুনিয়ার সমস্ড় অংশ জুড়ে কোনো এক সময় একটি মহাপ-াবন হয়েছিলো এমন কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

---

১০৫. আল কুর'আন, ৬৯:১১
১০৬. আল কুর'আন, ০৭:৬৪
১০৭. আদি পুস্ড়ক ০৭: ১৮-২৪

দুই. সারা দুনিয়ার অধিকাংশ জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটি মহাপ-াবনের কাহিনী শ্র“ত হয়ে আসছে। এমনকি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও নিউগিনির মতো দূরবর্তী দেশগুলোর পুরাকালের কাহিনীতেও এর উলে-খ পাওয়া যায়।

এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনো এক সময় এসব জাতির পূর্বপুর“ষরা পৃথিবীর একই ভূ খন্ডের অধিবাসী ছিলো এবং তখন সেখানেই এ মহাপ-াবন এসেছিলো। তারপর যখন তাদের বংশধররা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলো তখন এ ঘটনার কাহিনীও তারা সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলো।[১০৮]

শেষে হলো মহাপ-াবনঃ

আল-াহর হুকুম হলোঃ

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ •

“অবশেষে বলা হলোঃ ‘হে পৃথিবী, তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও! হে আকাশ, তুমি বর্ষণ বন্ধ করো।’ অতঃপর প-াবন শেষ হলো এবং ফায়সালা পূর্ণ হলো এবং নৌযানটি জুদি পাহাড়ের উপর এসে স্থির হলো। আর বলা হলোঃ ‘নিপাত গেলো যালিম সম্প্রদায়।”[১০৯]

মহান আল-াহর নির্দেশ। বিলম্ব করার সুযোগ নেই। সমুদ্রের বিশালতা নিয়ে যেই পানি দাপাদাপি করছিলো চারদিকে যমিন তা গিলে ফেললো। মুষলধারে ঝরছিলো যে বৃষ্টি তা থেমে গেলো। পৃথিবী তাকে ডুবিয়ে রাখা সব পানি চুষে খেয়ে ফেললো।

পানি কমে যাওয়ার পর প্রথমে দেখা দেয় পাহাড়গুলো। এরপর দেখা যায় মাটি। চারদিকে কাদা আর কাদা। ঘরদোরের চিহ্ন কোথাও নেই। সব খারাপ লোকেরা ধ্বংস হয়ে শেষ হয়ে গেলো। এখানে ওখানে পড়ে আছে অসংখ্য হাড়গোড়। সর্বত্রই শুধু নিরবতা। সমাজপতিদের অস্তিত্ব নেই। নেই তাদের বাহাদুরি। নেই হাঁকডাক। তাদের অনুসারীরাও নেই। তারা যাদেরকে রব বলে মেনে নিয়েছিলো সেই রবদের পরিণতিই তাদের কপালে জুটলো। আল-াহকে বিদ্র“প করার আর কেউ থাকলো না। থাকলো না আল-াহর রাসূলকে উত্যক্ত করার জন্যে কেউ। প্রভাবশালী আর

১০৮. সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০৬, পৃ.-২৭

১০৯. আল কুর’আন, ১১:৪৪

প্রতাপশালীদের প্রতাপ পানির তোড়ে ভেসে গেলো। তাদের জনবল, ধনবল কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারলো না আল-াহর পাঠানো প-াবনের বির"দ্ধে।[১১০]

১১০. এ.কে.এম. নাজির আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৮৪

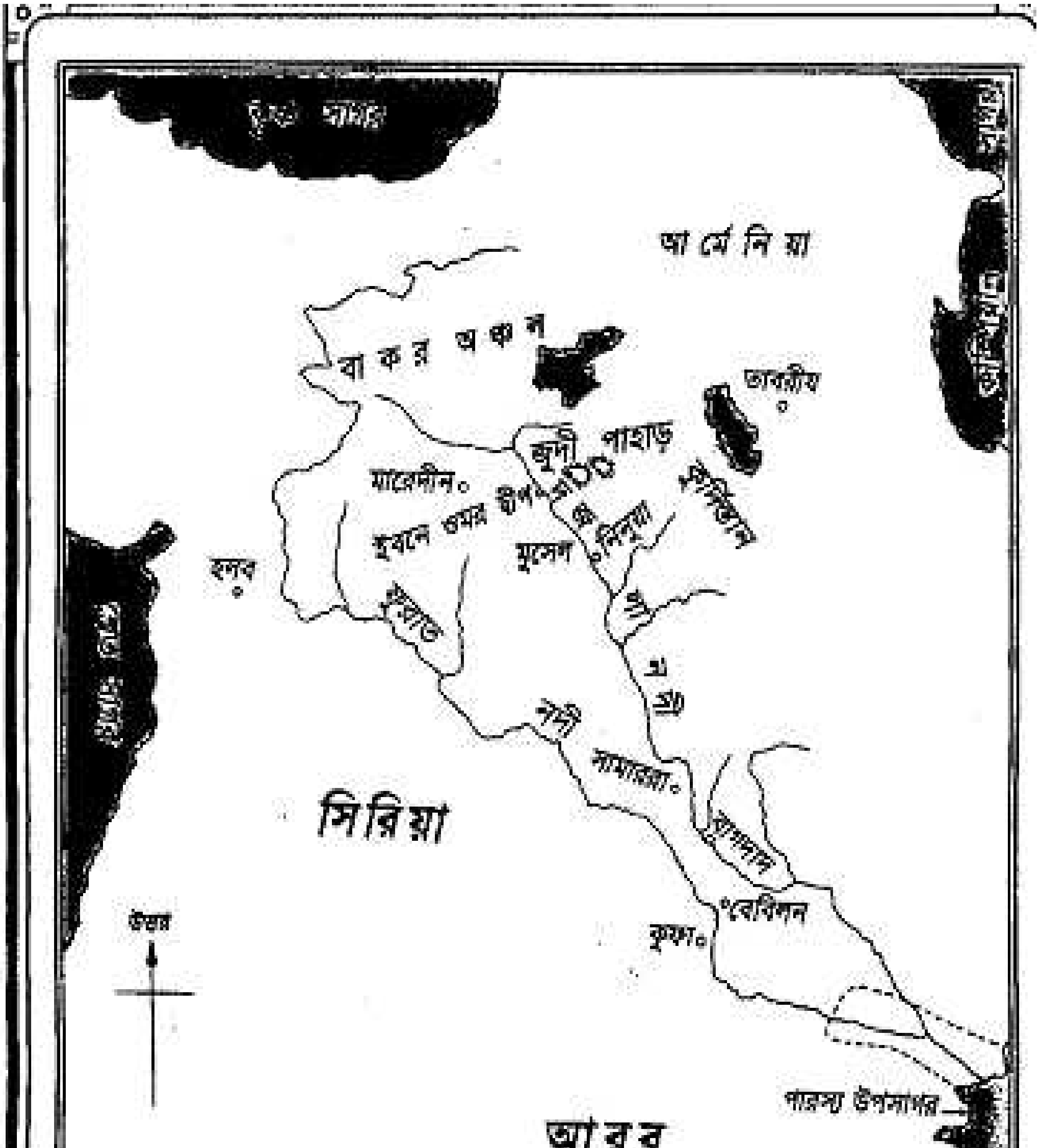

কওমে নূহ-এর এলাকা ও জুদী পাহাড়

নূহ (আ.) এর নৌযান থামার স্থান:

মহাপ-াবনে নূহ (আ.) এর নৌযানের মানুষ আর প্রাণীগুলো ছাড়া বাকী সব প্রাণী মরে গেলো। প-াবন শেষে নূহ (আ.) তাঁর সাথীদের নিয়ে নেমে আসেন পৃথিবীতে। নূহ (আ.) এর নৌযানটি জুদি পাহাড়ের চূড়ায় এসে ঠেকেছিলো। বাইবেলে উলে-খিত নৌযানটির অবস্থান স্থলের নাম আরারত বলা হয়েছে। জুদি পাহাড় হলো, আর্মেনিয়া থেকে কুর্দিস্ড়ান পর্যন্ড় যে দীর্ঘ পর্বতমালা রয়েছে তার একটি। আজো এ পাহাড়টি এই নামেই পরিচিত। প্রাচীন ইতিহাসে এটাকেই নৌযান থামার জায়গা হিসেবে উলে-খ করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের আড়াই বছর আগে বেরাসাস (BERASUS) নামে ব্যাবিলনের একজন ধর্মীয় নেতা পুরাতন কুলদানী বর্ণনার ভিত্তিতে নিজের দেশের যে ইতিহাস লেখেন তাতে তিনি জুদী নামক স্থানকেই নূহের নৌযান থামার জায়গা হিসেবে উলে-খ করেন। এরিস্টটলের শিষ্য এবিডেনাস (ABYDENUS) তাঁর ইতিহাসে তাঁর যুগের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, ইরাকের বহু লোকের কাছে যে নৌকার খন্ডিত অংশগুলো সংরক্ষিত আছে। এগুলো ধুয়ে ধুয়ে তারা রোগ নিরাময়ের জন্যে রোগীদের পানি পান করায়।[১১১]

নূহ (আ.) এর নৌযান : মানব জাতির জন্যে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ •

"তারপর আমরা নাযাত দিয়েছিলাম তাকে (নূহকে) এবং নৌযানে আরোহীদেরকে আর এ ঘটনাকে করে দিয়েছি জগতবাসীর জন্যে একটি নিদর্শন।"[১১২]

এ আয়াতের এই অর্থও হতে পারে যে, আল-াহ নূহ (আ.) এর জাতির এ আযাবকে পরবর্তী বংশধরদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছেন। তবে সর্বাধিক অগ্রাধিকারযোগ্য অর্থ হচ্ছে, সে নৌযানটিকে শিক্ষণীয় নিদর্শন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি সুউচ্চ পর্বতের ওপর নৌযানটির অস্ড়িত্ব টিকে থাকা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে আল-াহর গযব সম্পর্কে সাবধান করে আসছে। এ নিদর্শনটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এ ভূখন্ডে আল-াহর নাফরমানদের জন্যে কি দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিলো এবং ঈমান গ্রহণকারীদের কিভাবে রক্ষা করা হয়েছিলো। বিদ্যমান এ নৌযানটি পরবর্তী মানুষদের জন্যে এ সংবাদ বহন করতে থাকলো যে দুনিয়ায় ভয়ংকর একটি প-াবন এসেছিলো এবং সে প-াবনে এ নৌযানটি পাহাড়ের ওপরে আটকে গিয়েছিলো।

১১১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০৬, পৃ.-২৬

১১২. আল কুর'আন, ২৯:১৫

নূহ (আ.)-এর নৌযান থামার স্থান

বর্তমান সময়েও শোনা যায়, নূহ (আ.) এর নৌযানের সন্ধানে মাঝে মাঝে অভিযান পাঠানো হয়। কারণ অনেক সময় আরারাত পর্বতমালার ওপর দিয়ে যখন কোনো পে- ন চলে, তখন পাইলটগণ পাহাড়ের মাথায় নৌযানের মতো কিছু একটা দেখতে পায়।

সাম্প্রতিক কালে 'ফক্স নিউজ' এর একটি খবরে জানা যায়, চীনা আর তুরস্কের গবেষকদল তুরস্কের মাউন্ট আরারাতে কাঠের তৈরি একটি প্রাচীন জাহাজের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের দাবি হচ্ছে, এটিই নূহ (আ.) এর সেই বিখ্যাত নৌযান যা প−াবন থেকে নবীর অনুসারীদের বাঁচিয়েছিলো। এ অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪,৭০০ ফুট উঁচুতে বলে উলে- খ করা হয়েছে। প্রাপ্ত কাঠামোর অভ্যন্ড়রীণ গঠন এবং কার্বনটেস্টের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত হয়েছেন এর বয়স প্রায় ৪,৮০০ বছর।[১১৩]

'নোয়াস আর্ক মিনিস্ট্রিজ' এর একজন মুখপাত্র 'ইয়াং উইং চেং' এর বরাতে সংবাদ মাধ্যমটি জানিয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা ও তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকরা ৯৯.৯ ভাগ নিশ্চিত যে এটা নুহ (আ:) এর সেই জাহাজেরই ধ্বংসাবশেষ।

ঐ মুখপাত্র আরো জানিয়েছেন যে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তারা কিছু অক্ষত দেয়াল এবং শেলফের সন্ধানও পেয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, সেই মহাপ- াবনের সময় এখানেই রাখা হয়েছিলো বিভিন্ন প্রজাতির সব প্রাণী এবং উদ্ভিদ।[১১৪]

নূহ (আ.) এবং তাঁর জাতির ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবীদের আহ্বান এবং শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হলে মানুষের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য যেমনভাবে ধ্বংস হয়েছিলো নূহ (আ.) এর জাতির অবাধ্য লোকেরা।

অপরদিকে নবীর প্রকৃত অনুসারীদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং আল- াহ তা'য়ালা। যেমন করে তিনি রক্ষা করেছিলেন নূহ (আ.) এর জাতির ঈমানদার লোকদের। ভয়ংকর সে প- াবন ঈমানদার লোকদের এতোটুকুও ক্ষতি করতে পারেনি। ঈমানের পথে থাকার কারণেই তারা হয়েছিলেন সৌভাগ্যবান। এভাবেই আল- াহ সৎ লোকদের প্রতিষ্ঠিত করে দেন পৃথিবীর বুকে। আর আখেরাতের প্রাপ্তিতো আছেই!

---

১১৩. তথ্যসূত্রঃ *ইন্টারনেট*, (bangladeshnews24.com.bd)

১১৪. প্রাগুক্ত

আরারাত পর্বতমালায় নূহ (আ.)-এর নৌযান

২য় পরিচ্ছেদ

নির্মম ধ্বংসের কবলে ক্ষমতাধর আদ জাতি

‘আদ’ ছিলো আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিলো। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও গৌরব গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিলো। তারপর দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিলো। আদ জাতির এ বিপুল পরিচিতির কারণেই আরবি ভাষায় প্রত্যেকটি প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্যে ‘আদি’ শব্দ ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে ‘আদিয়াত’ বলা হয়। যে জমির মালিক বেঁচে নেই এবং চাষাবাদকারী না থাকার কারণে যে জমি অনাবাদ পড়ে থাকে তাকে আদি-উল-আরদ বলা হয়। প্রাচীন আরবি কবিতায় আমরা প্রচুর পরিমাণে এ জাতির নামের ব্যবহার দেখি। আরবের বংশধারা বিশেষজ্ঞগণও নিজেদের দেশের বিলুপ্ত জাতিদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ জাতিটির নাম উচ্চারণ করে থাকেন। তারা এক মহাপরাক্রমশালী জাতি ছিলো এবং হযরত নূহ (আ.) এর সময়ের অব্যবহতি পরে তাদের আবির্ভাব হয়েছিলো। সে কালে আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি ছিলো আদ জাতি। তাদের ছিলো অসামান্য দৈহিক শক্তি আর ছিলো বিরাট রাজ শক্তি। নূহ (আ.) এর তুফানের পর তারাই সর্বপ্রথম মুর্তিপূজা শুর“ করে।[১১৫]

হযরত নূহ (আ.) এর জাতির ধ্বংসের পর আল-াহ তা’য়ালা আদ জাতিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করার সুযোগ দান করেন। তৎকালে শৌর্যবীর্যের দিক দিয়ে তাদের সমতুল্য আর কেউ ছিলো না। শুধু খোদাদ্রোহিতার অপরাধে তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।[১১৬]

আল কুর’আনে আদ জাতির উলে- খ

আল কুর’আনের নয়টি সূরায় আদ জাতির আলোচনা করা হয়েছে। সূরাগুলো হলো: ০১. সূরা আরাফ, ০২. সূরা হুদ, ০৩. সূরা মুমেনূন, ০৪. সূরা শু‘আরা, ০৫. সূরা আত-তাওবা, ০৬. সূরা আহকাফ, ০৭. সূরা আয্যারিয়াত, ০৮. সূরা আল ক্বামার, ০৯. সূরা আল হাক্কাহ।

---

১১৫. প্রফেসর ডাক্তার ফার“ক আহমদ, *আদ জাতির নবী হুদ (আ.)*, (bm.therport24.com, ০৮ মে ২০১৫)
১১৬. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮

আদ জাতির যুগ

আদ জাতির যুগ হযরত ঈসা (আ.) এর প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে বলে অনুমান করা হয়। কুর'আনে আদ জাতিকে من بعد قوم نوح (নূহের জাতির পরে) বলে গণ্য করা হয়েছে।[১১৭]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে নূহ (আ.)-এর পরবর্তী জাতিগুলোর অন্যতম জাতি এই আদ জাতি।

আদ জাতির আবাসস্থল

আল কুর'আনের বর্ণনা মতে এই জাতিটির আবাসস্থল ছিলো 'আহকাফ' এলাকা। এ এলাকাটি হিজায, ইয়েমেন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী 'রাবয়ুল খালী' এর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তারা ইয়েমেনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ড় নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্ড়ৃত করেছিলো। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই জাতিটির নিদর্শনাবলী পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ আরবের কোথাও কোথাও এখনো কিছু পুরাতন ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। সেগুলোকে আদ জাতির নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে। হাজরা মাউতে এক জায়গায় হযরত হুদ (আ.) এর নামে একটি কবরও পরিচিতি লাভ করেছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে James R. Wellested নামক একজন ইংরেজ নৌ-সেনাপতি 'হিসনে গুরাবে' একটি পুরাতন ফলকের সন্ধান লাভ করেন এতে হযরত হুদ (আ.)-এর উলে- খ রয়েছে। এই ফলকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে স্পষ্ট জানা যায়, এটি হযরত হুদের শরীয়াতের অনুসারীদের লেখা ফলক।[১১৮]

আলী (রা.) হাযরামাউতের একজন অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি হায্‌রামাউতের সরেযমিনে এমন কোনো রঙিন পাহাড় দেখেছো যার মাটি লাল বর্ণের? সেই পাহাড়ের অমুক অমুক ধারে কুল (বরই) ও পীলুর অনেক গাছ রয়েছে?" লোকটি উত্তরে বললো: "হ্যাঁ, আমির্ল্ল মুমিনীন! আল-াহর শপথ! আপনি এমনভাবে বললেন যে, যেন আপনি নিজের চোখে দেখেছেন।" তিনি বললেন: "আমি নিজের চোখে দেখিনি, কিন্তু এমন হাদিস আমার কানে পৌঁছেছে।" লোকটি বললো: "হে আমির্ল্ল মুমিনীন! এ ব্যাপারে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?" তিনি উত্তরে বললেন: "সেখানে হুদ (আ.)-এর কবর রয়েছে। এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, আদ জাতির বাসস্থান ইয়েমেনেই ছিলো। হযরত হুদ (আ.) এর কবরও সেখানেই হয়েছে।[১১৯]

---

১১৭. মাওলানা হিফযুর রহমান- প্রাগুক্ত, খন্ড-০১, পৃ.-৯২

১১৮. আবদুল-াহ মোহাম্মদ জোবায়ের, *হযরত হুদ (আ.)*, (al-jannatbd.com, ১০ মার্চ ২০১৫)

১১৯. হাফেয মাওলানা হুসাইন ইব্‌ন সোহ্‌রাব, *তাফসির আল-মাদানি* (ঢাকা: হুসাইন আল-মাদানি প্রকাশনী, জুন-২০০১), খন্ড-০৩, পৃ.-২২০

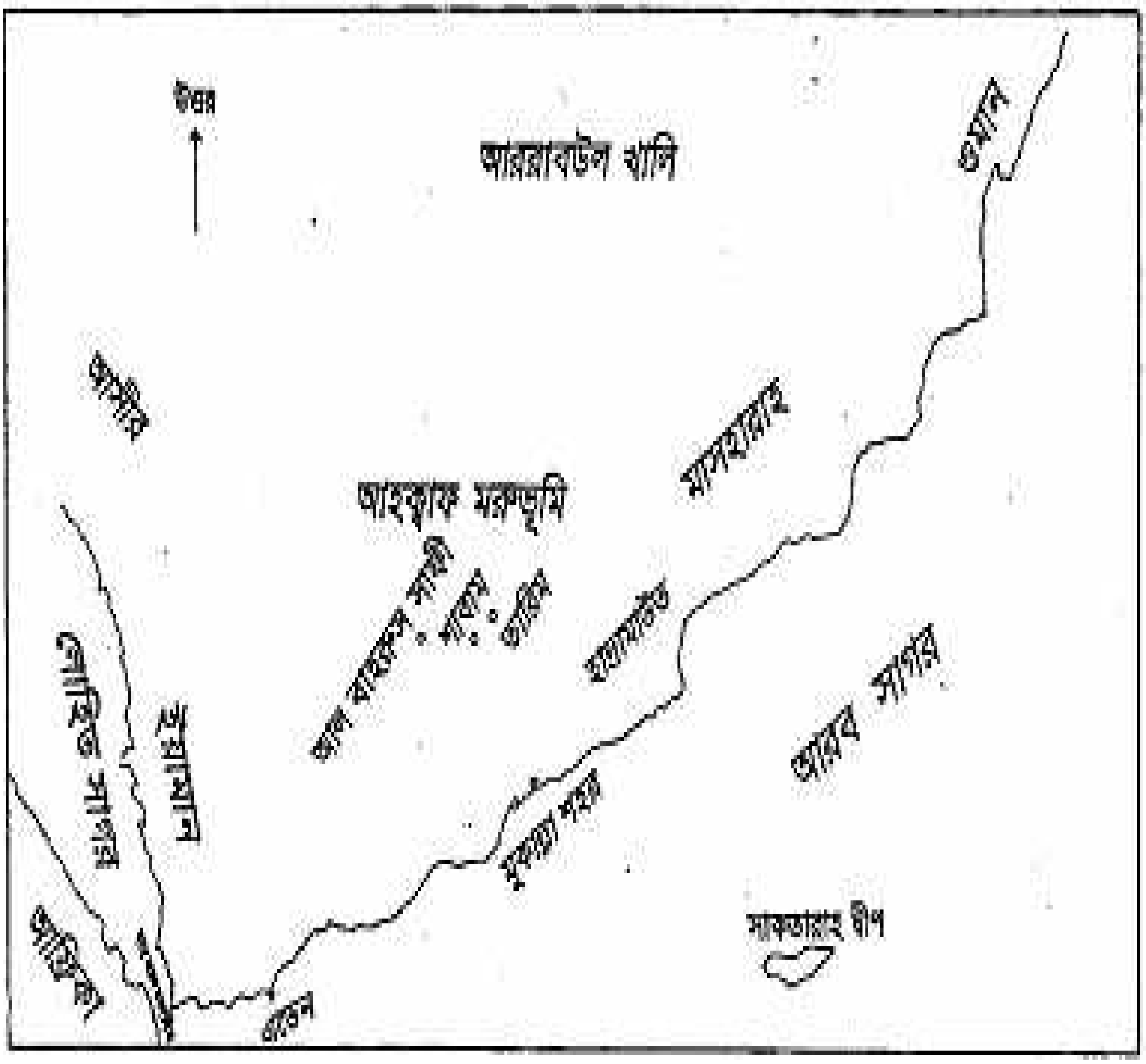

আদ জাতির বাসস্থান: আহকাফ মরুভূমি

আদ জাতির আবাসস্থলের বর্তমান অবস্থা

ইবন ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে আদ জাতির আবাস ভূমি ওমান থেকে ইয়েমেন পর্যন্ড় বিস্তৃত ছিলো। আল কুর'আন মজিদ আমাদের বলছে, তাদের আদি বাসস্থান ছিলো আল-আহক্বাফ। এখান থেকে বেরিয়ে তারা আশেপাশের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং দূর্বল জাতিসমূহকে গ্রাস করে ফেলেছিলো। বর্তমান কাল পর্যন্ড়ও দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে আছে যে, এই এলাকাই ছিলো আদ জাতির আবাস ভূমি। বর্তমানে 'মুকাল-া' শহর থেকে উত্তর দিকে ১২৫ মাইল দূরত্বে হাদরামাউতের একটি স্থানে লোকেরা হযরত হুদ (আ.)-এর একটি মাযার তৈরি করে রেখেছে। সেটি হুদের কবর নামেই বিখ্যাত। প্রতি বছর ১৫ই শা'বান সেখানে 'উরস' হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এই কবরটি হুদের কবর হিসেবে প্রমাণিত নয়। কিন্তু সেখানে তা নির্মাণ করা এবং দক্ষিণ আরবের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কম করে হলেও এতোটুকু অবশ্যই প্রমাণ করে যে, আঞ্চলিক ঐতিহ্য এই এলাকাকেই আদ জাতির এলাকা বলে চিহ্নিত করে। এ ছাড়া হাদরামাউতে এমন কতিপয় ধ্বংসাবশেষ আছে যেগুলোকে আজ পর্যন্ড় স্থানীয় অধিবাসীরা আদ জাতির আবাসভূমি বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

আহকাফ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এক সময় এখানে জাঁকালো সভ্যতার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতি বাস করতো। সম্ভবত হাজার হাজার বছর পূর্বে এটা এক উর্বর অঞ্চল ছিলো। পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন একে মর‍ুভূমিতে পরিণত করেছে। বর্তমানে এই এলাকা একটি বিশাল মর‍ুভূমি, যার অভ্যন্ড়রীন এলাকায় যাওয়ার সাহস কারো নেই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাভেরিয়ার একজন সৈনিক এর দক্ষিণ প্রান্ড় সীমায় পোঁছে ছিলো। তার বক্তব্য হলো: যদি হাদরামাউতের উত্তরাঞ্চলের উচু ভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, তাহলে বিশাল এ মর‍ুপ্রান্ড়র এক হাজার ফুট নীচুতে দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মাঝে মাঝে এমন সাদা ভূমিখন্ড দেখা যায় যেখানে কোনো বস্তু পতিত হলে তা বালুকা রাশির নীচে তলিয়ে যেতে থাকে এবং একেবারে পচে খসে যায়। আরব বেদুইনরা এ অঞ্চলকে ভীষণ ভয় করে এবং কোনো কিছুর বিনিময়েই (সেই সৈনিককে) সেখানে (নিয়ে) যেতে রাজি হয় না। এক পর্যায়ে বেদুইনরা তাকে সেখানে নিয়ে যেতে রাজি না হলে সে একাই সেখানে চলে যায়। তার বর্ণনা অনুসারে এখানকার বালু একেবারে মিহি পাউডারের মতো। সে দূর থেকে বালুর মধ্যে একটি দোলক নিক্ষেপ করে। ৫ মিনিটের মধ্যেই তা তলিয়ে যায় এবং যে রশির সাথে তা বাঁধা ছিলো তার প্রান্ড় গলে যায়।[১২০]

---

১২০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-১৪, পৃ.-১৯৭-১৯৯

আদ জাতির ধর্ম

আদ জাতি মূর্তিপূজক ছিলো। মূর্তি নির্মাণের কাজেও তারা অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলো। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন এদের বাতিল মাবুদগুলোও নূহ (আ.) এর কাওমের বাতিল মাবুদগুলোর মতো ওয়াদ্, সুওয়া, ইয়াগূছ এবং নাস্রই ছিলো। হযরত আবদুল-াহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের একটি মূর্তির নাম ছাসূদ এবং অন্য একটির নাম হাতার ছিলো। 'ছাদা' নামেও তাদের একটি বিখ্যাত মূর্তি ছিলো।[১২১]

আদ জাতির প্রতি প্রেরিত নবী হযরত হুদ (আ.)

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا •

"আর আদ জাতির কাছে আমি পাঠাই তাদের ভাই হুদকে।"[১২২]

আদ জাতি নিজেদের রাজত্বে জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতো। তারা তাদের শারীরিক শক্তির অহংকারে এতই মগ্ন ছিলো যে, তারা এক আল-াহকে ভুলে গিয়েছিলো। তারা তাদের নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে মাবুদ মেনে নিয়ে তাদের পূজা-উপাসনা শুর“ করলো। তারা মূর্তিগুলোর কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে বায়ুর দেবতা, কাউকে ধন সম্পদের দেবতা আবার কাউকে রোগের দেবতা বলে মনে করতো।

আর তখনই আল-াহ রাব্বুল আ'লামিন (তাদের হেদায়েতের জন্যে) তাদের মধ্যে থেকেই হযরত হুদ (আ.)-কে পাঠালেন। হযরত হুদ (আ.) তাঁর জাতির মধ্যে সম্ভ্রান্ড় বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ছিলেন আদ জাতির সবচেয়ে বেশি সম্মানিত বংশ 'খুলুদ' এর একজন।[১২৩]

হযরত হুদ (আ.) এর জাতি দৈহিক অবয়বের দিক দিয়ে যেমন ছিলো কঠিন তেমনই তাদের অন্ড়রও ছিলো অত্যন্ড় কঠিন। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে তারা খুব পারদর্শী ছিলো। আল-াহর প্রেরিত নবি হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে এক আল-াহর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানান।

---

১২১. মাওলানা হিফযুর রহমান: প্রাগুক্ত, খন্ড-০১, পৃ. ৯২

১২২. আল কুর'আন, ০৭:৬৫

১২৩. মাওলানা হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত।

হযরত হুদ (আ.) এর দা'ওয়াত

হযরত হূদ (আ.) তাঁর জাতিকে আল-াহর একত্ব ও ইবাদতের প্রতি দা'ওয়াত দিলেন। মানুষের প্রতি যুলুম করতে নিষেধ করলেন।

তাঁর জাতির প্রতি হুদ (আ.) এর দা'ওয়াত ছিলো এ রকম:

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ •

"তিনি বললেন: হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল-াহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। এরপরও কি তোমরা ভুল পথে চলার ব্যাপারে সাবধান হবে না?"[১২৪]

কিন্তু তাঁর জাতি তাঁকে কঠোরভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। তারা অহংকার ও গর্বের সাথে বলতে লাগলো,

مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

"আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আবার কে?"[১২৫]

আদ জাতির অবস্থা ছিলো এরকম, তারা আল-াহকে অস্বীকার করতো না বা আল-াহ সম্পর্কে তারা অজ্ঞও ছিলো না। এমনকি তারা আল-াহর ইবাদত করতেও অস্বীকার করছিলো না। আসলে তারা হযরত হুদ (আ.)-এর একমাত্র আল-াহর বন্দেগী করতে হবে এবং তাঁর বন্দেগীর সাথে আর কারোর বন্দেগী যুক্ত করা যাবে না- এ বক্তব্যটিই মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলো।

হযরত হুদ (আ.) অবিরাম তাঁর কাওমের লোকদেরকে আল-াহর পথে ডাকতে থাকলেন এবং আল-াহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করতে থাকলেন। হযরত হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে নূহ (আ.) এর জাতির ঘটনাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতেন। অহংকার ও অবাধ্যতার দরুন সেই জাতির কি ভয়াবহ পরিণাম হয়েছিলো!

হযরত হুদ (আ.) এর জাতি নিজেদের শারীরিক শক্তি ও রাজকীয় ক্ষমতার অহংকারে মেতে ছিলো। হুদ (আ.) তাদেরকে আহ্বান করেছিলেন সত্য পথে আসার।

১২৪. আল কুর'আন, ০৭:৬৫
১২৫. আল কুর'আন, ৪১:১৫

কুর'আনের বর্ণনায় হযরত হুদ (আ.) এর আহ্বান ছিলো এরকম:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ • إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ • فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُونِ • وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ • أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ • وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ • وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ • فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُونِ • وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ • أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ • وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ •إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ •

"স্মরণ করো, তাদের ভাই হুদ তাদের বলেছিলো: তোমরা কি সতর্ক হবে না? আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ড় রাসূল। অতএব, তোমরা আল-াহ্কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি তো তোমাদের (সতর্ক করার) এ দায়িত্ব পালনের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমাকে প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের। তোমরা কেন প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক স্মৃতি স্ড়ম্ভ নির্মাণ করছো? তোমরা এমন সব শৈল্পিক প্রাসাদ নির্মাণ করছো যেনো তোমরা এখানে চিরস্থায়ী হবে! যখন তোমরা ক্ষমতা পাও, তখন স্বৈরাচারি ক্ষমতা প্রয়োগ করো। সুতরাং আল-াহ্কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ভয় করো তাঁকে যিনি তোমাদের সব (উত্তম সামগ্রী) দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা জানো। তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন পশু সম্পদ এবং সন্ড়ান সন্ড়তি দিয়ে, বাগ-বাগিচা এবং ঝরণাধারা দিয়ে। আমি আশংকা করছি তোমাদের উপর আল-াহ্র পক্ষ থেকে বড় কোনো আযাব এসে পড়ার।"[১২৬]

হযরত হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে অন্যায় আর অবাধ্যতা থেকে বেরিয়ে এসে তাওবা করার আহ্বান জানালেন।

يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ •

"হে আমার কাওম! তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমাদের রবের কাছে, অতঃপর ফিরে আসো তাঁর দিকে। তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করবেন এবং বর্তমান শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"[১২৭]

---

১২৬. আল কুর'আন, ২৬:১২৪-১৩৫

১২৭. আল কুর'আন, ১১:৫২

আদ জাতির মধ্যে অল্প কিছু লোকই ছিলো যারা ঈমানদার। বাকী সবাই ছিলো উদ্ধত ও অবাধ্য। তাদের কাছে হযরত হুদ (আ.) এর উপদেশ অস্বস্তিকর মনে হতো। তারা হযরত হুদ (আ.) এর কথাগুলোকে মিথ্যা বলতে লাগলো এবং তাঁর সাথে বিদ্রূপ করা শুরু করলো।

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ •

"তারা বলেছিলো: হে হুদ! তুমি তো আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসোনি। আমরা তো তোমার কথায় আমাদের ইলাহ্দের (দেব-দেবীদের) পরিত্যাগ করতে পারি না। তাছাড়া আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই।"[১২৮]

হুদ (আ.) তাদের বিদ্রূপের জবাবে বললেন:

إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّـهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ •

"আমরা বলছি, তোমার উপর আমাদের দেব-দেবীদের অভিশাপ পড়েছে। তিনি বলেছিলেন: "আমি আল-াহ্কে সাক্ষী বানাচ্ছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো, তোমরা যাদেরকে আল-াহ্র সাথে শরিক করছো আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি।"[১২৯]

এত বোঝানোর পরও আদ জাতির অবাধ্যতা এবং বিরোধিতা ক্রামন্বয়ে বেড়েই চললো। তারা হুদ (আ.)-কে পাগল ও বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ বলে অভিহিত করতে লাগলো। হযরত হুদ (আ.) তাদের এ অবিরাম বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার বিরুদ্ধে তাদেরকে হুঁশিয়ারি করে বললেন:

فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ •

"আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো, আমি তোমাদের কাছে যে বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমার রব তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো কাওমকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আমার রব সব কিছুর রক্ষক।"[১৩০]

---

১২৮. আল কুর'আন, ১১:৫৩
১২৯. আল কুর'আন, ১১:৫৪
১৩০. আল কুর'আন, ১১:৫৭

আদ জাতির ধ্বংসের পূর্বের সচ্ছলতা

আরববাসীর ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং বর্তমান প্রত্মতাত্বিক আবিষ্কার থেকে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রথম যুগের আদ একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং তাদের স্মৃতি চিহ্নগুলোও দুনিয়া থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। আরব ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে লুপ্ত জাতি বলে গণ্য করে। আবার এটাও আরব ইতিহাসের সর্বসম্মত কথা যে, আদ জাতির শুধুমাত্র ঐ অংশই অবশিষ্ট ছিলো যারা ছিলো হযরত হুদ (আ.) এর অনুসারী। আদ জাতির এ অবশিষ্ট অংশকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়েছে। 'হিসনে গোরাবে' শিলালিপিটি তাদের স্মৃতি চিহ্নসমূহের একটি। এ শিলালিপিটি হযরত ঈসার জন্মের প্রায় ১৮ বছর পূর্বের বলে মনে করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ শিলালিপিটির যে উৎকীর্ণ লিখন পড়েছেন তার কয়েকটি বাক্য নিচে দেয়া হলো:

"আমরা দীর্ঘকাল যাবত এ দূর্গে এমন প্রভাব প্রতিপত্তিসহ বসবাস করেছি যে, দারিদ্র ও অসচ্ছলতা আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। আমাদের নদীগুলো কানায় কানায় পূর্ণ থাকতো এবং শাসকগণ এমন বাদশাহ ছিলেন যাদের চিন্ড়াধারা ছিলো পবিত্র ও পরিশুদ্ধ এবং অনাচার ও দুস্কৃতির প্রতি তাঁরা ছিলেন কঠোর। তাঁরা হুদ (আ.) এর শরীয়ত অনুযায়ী আমাদের উপর শাসন চালাতেন এবং সুন্দর সিদ্ধান্ড়গুলো একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হতো। আমরা মু'জিযা ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান রাখতাম।"[১৩১]

পবিত্র কুর'আনে যে কথা বিবৃত হয়েছে যে, 'আদ জাতির প্রাচীন মহিমা, গৌরব ও সমৃদ্ধির উত্তরাধিকারী তারাই হয়েছিল যারা হুদ (আ.) এর প্রতি ঈমান এনেছিলো।' এ লিপিটি আজো এরই সত্যতা প্রমাণ করে যাচ্ছে।

আল কুর'আনে তাদের সমৃদ্ধি ও গর্ব অহংকারের উলে- খ

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّـهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ •

১৩১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০১, পৃ.-১২

"তোমরা কি তাজ্জব হচ্ছো যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে একটি উপদেশ এসেছে- যাতে করে তিনি তোমাদের সতর্ক করতে পারেন? স্মরণ করো যখন নূহের কাওমকে (ধ্বংস করার) পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং দৈহিক গঠনে তোমাদেরকে অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল-াহ্‌র অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করো, যাতে করে তোমরা সফলতা অর্জন করো।"[১৩২]

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ •

"যাদের মতো কোনো জাতি সৃষ্টি করা হয়নি কোনো দেশে।"[১৩৩]

তাদের সভ্যতা ছিলো খুব উন্নত। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিলো উঁচু উঁচু দালান কোঠা তৈরি করা। আর এজন্যে তারা দুনিয়ায় খ্যাতি লাভ করেছিলো।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ • إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ •

"তুমি কি দেখনি তোমার রব কি ধরনের আচরণ করেছেন আদ জাতির সাথে। ইরাম গোত্রের সাথে, যারা ছিলো খুঁটির মতো দীর্ঘকায়?"[১৩৪]

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ •

"আদ জাতি অন্যায়ভাবে দেশে দম্ভ করেছিল। তারা বলেছিল: 'আমাদের চেয়ে শক্তিমান আর কে আছে?' তবে কি তারা ভেবে দেখেনি যে, আল-াহ্‌ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিমান। আসলে তারা আমাদের আয়াতকেই অস্বীকার করতো।"[১৩৫]

তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিলো কয়েকজন বড় বড় স্বৈরাচারির হাতে যাদের সামনে কেউ কোনো শব্দ করতে পারতো না।

وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ •

১৩২. আল কুর'আন, ০৭:৬৯
১৩৩. আল কুর'আন, ৮৯:০৮
১৩৪. আল কুর'আন, ৮৯:০৬-০৭
১৩৫. আল কুর'আন, ৪১:১৫

"তারা ছিলো আদ জাতি, তারা তাদের রবের আয়াত অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর রাসূলদের অমান্য করেছিল এবং প্রত্যেক অহংকারী স্বৈরাচারীর অনুসরণ করেছিল।"[১৩৬]

ধর্মীয় দিক থেকে তারা আল-াহকে স্বীকার করতো কিন্তু তারা ছিলো শিরকে লিপ্ত। তারা এ কথা মানতো না যে, দাসত্ব ও আনুগত্য একমাত্র আল-াহর।

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ •

"তারা বলেছিল: 'তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছো যে, আমরা কেবল এক আল-াহ্র ইবাদত-আনুগত্য করবো আর আমাদের পূর্ব পুর"ষরা যাদের ইবাদত করতো তাদের পরিত্যাগ করবো? সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে আমাদেরকে যে জিনিসের ওয়াদা দিচ্ছো তা এনে দেখাও।"[১৩৭]

যেসব কারণে ধ্বংস হয় আদ জাতি

চিন্ড়া-চেতনার দিক থেকে আদ জাতির এমন কিছু সমস্যা ছিলো যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সেগুলো হলো:

ক. তারা আল-াহর অনুগ্রহগুলোর অবমূল্যায়ন করেছিলো এবং শয়তানের অনুগামী হয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছিলো।

খ. আল-াহর গযব থেকে বাঁচার জন্যে তারা বিভিন্ন কল্পিত দেব-দেবীর অর্চনা শুর" করেছিলো।

গ. তারা আল-াহর নিয়ামতগুলোকে চিরস্থায়ী ভেবেছিলো।

ঘ. আল-াহর নবীকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

ঙ. আল-াহর গযব থেকে তারা নির্ভীক হয়ে গিয়েছিলো।

কর্মের দিক থেকেও আদ জাতি এমন কিছু কাজের সাথে লিপ্ত ছিলো যা তাদের ধ্বংসকে করে তোলে অনিবার্য।

ক. তারা অযথা উঁচু জায়গায় সুউচ্চ টাওয়ার ও নিদর্শনাদি তৈরি করতো। যা ছিলো শুধুই অপচয়। তারা ভাবতো, এসব প্রাসাদে তারা চিরকাল থাকবে।

খ. তারা দূর্বলদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানতো এবং মানুষের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতো।[১৩৮]

---

১৩৬. আল কুর'আন, ১১:৫৯

১৩৭. আল কুর'আন, ০৭:৭০

১৩৮. আলী হাসান তৈয়ব, *যে পাপে ধ্বংস হয় আদ জাতি* (অনলাইন পত্রিকা 'আলোকিত বাংলাদেশ' ১৮ নভেম্বর ২০১৫)

আল কুর'আনের বর্ণনায় আদ জাতির আযাব

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ •

"ফলে আমরা তাদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম প্রচণ্ড ঝড়বায়ু এক অশুভ দিনে, তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে। তাছাড়া আখিরাতের আযাব তো এর চাইতেও অপমানকর এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।"[১৩৯]

তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের ওপর এক প্রচন্ড ঘুর্নিবার্তা প্রেরণ করে আল-াহ তা'য়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ঐ বাতাস তাদের আকাশে নিয়ে উড়ছিলো এবং পরে মাথার ভরে যমিনে নিক্ষেপ করে দিচ্ছিলো। ফলে তাদের মাথাগুলো ভেঙে দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলো।[১৪০]

তারা যখন কুফরীর ওপর অটল থাকলো তখন আল-াহ তা'য়ালা তাদের ওপর তিন বছর পর্যন্ড় তাদের ওপর বৃষ্টি বন্ধ করে রাখলেন।[১৪১]

এই পুরো সময় বৃষ্টি বন্ধ থাকলেও আল-াহর আযাব বন্ধ হয়নি। বিরামহীন ভাবে বৃষ্টিহীন ঝড়ো বাতাস বইতে থাকে। এ এমনি বাতাস যা বৃক্ষলতাকে সতেজ করেনা, এর মধ্যে নেই কোনো কল্যাণ, নেই কোনো বরকত। এটা কল্যাণহীন ঝঞ্ঝাবায়ু। তাদের স্ত্রীলোকদের বন্ধ্যা করে রাখা হয়। বলা হয়ে থাকে এর সূচনা হয়েছিলো এক শাওয়াল মাসের শেষ বুধবারে আবার শেষও হয়েছিলো বুধবারে।[১৪২]

আল কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে এ আযাবের বিভীষিকাময় চিত্র ফুটে উঠেছে। সাত রাত এবং আট দিন পর্যন্ড় সাইক্লোন চালিয়ে রাব্বুল আলামিন ইতিহাসের অন্যতম ক্ষমতাধর জাতিকে এমনভাবে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন যে তাদের কোনো চিহ্নই আর থাকলো না।

---

১৩৯. আল কুর'আন, ৪১:১৬

১৪০. হাফেজ ইমামুদ্দিন ইবন্ কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড- , পৃ.-৩২৬

১৪১. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৪, পৃ.-৬২২

১৪২. কাযী ছানাউল-াহ পানিপথী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৬, পৃষ্ঠা-৩১৬; খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬৭১; খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৯৯

কুর'আনের বর্ণনায় এ আযাব:

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ • فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ •

"আল-াহ সেটি তাদের উপর প্রবাহিত রেখেছিলেন সাত রাত আট দিন অবিরাম। তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে দেখতে, পুরো জাতিটি সেখানে (মরে) লুটিয়ে পড়ে আছে উপড়ে পড়া খেজুর গাছের কান্ডের মতো। তুমি তাদের কাউকেও অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছো কি?"[১৪৩]

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ • فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ • تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ •

"তিনি বলেছিলেন: 'সে জিনিসের ইলম তো কেবল আল-াহ্র কাছেই রয়েছে। আমাকে যে জিনিস নিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তোমাদেরকে কেবল সেই বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা তো একটি জাহেল কাওম। তারপর তারা যখন তাদের উপত্যকাসমূহের দিক থেকে মেঘ আসতে দেখলো, তখন তারা বললো: 'এতো মেঘ, এখন আমাদের এখানে বৃষ্টিপাত হবে।' হূদ বললো: 'না, বরং এ তো সেই জিনিস, তোমরা যার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছিলে। এ হলো সেই ঝড় যাতে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।' এ ঝড় আল-াহ্র নির্দেশে ধ্বংস করে দেবে সবকিছুই। তারপর যখন সকাল হলো, তখন বসতি ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিলো না। এভাবেই আমরা শাস্তি দিয়ে থাকি অপরাধীদের।"[১৪৪]

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ • مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ •

"নিদর্শন রয়েছে আদ সম্প্রদায়ের ঘটনাতেও। আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক ঝঞ্ঝা ঝড়। তা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, সবই ধূলিস্যাত করে দিয়েছিল।"[১৪৫]

---

১৪৩. আল কুর'আন, ৬৯:০৭-০৮

১৪৪. আল কুর'আন, ৪৬:২৩-২৫

১৪৫. আল কুর'আন, ৫১:৪১-৪২

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ •

"ফলে আমরা তাদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম প্রচন্ড ঝড়বায়ু এক অশুভ দিনে, তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে। তাছাড়া আখিরাতের আযাব তো এর চাইতেও অপমানকর এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।"[১৪৬]

অমঙ্গলকর দিনের অর্থ এ নয় যে, দিনগুলোর মধ্যেই অমঙ্গল নিহিত ছিলো। আর আদ জাতির ওপর এ অমঙ্গলের দিন এসেছিলো বলেই যে আযাব এসেছিলো তাও ঠিক নয়। এর অর্থ যদি তাই হতো এবং ঐ দিনগুলোই অমঙ্গলকর হতো তাহলে দূরের ও কাছের সব কাওমের ওপরই আযাব আসতো। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে যেহেতু সেই দিনগুলোতে কাওমের ওপর আল-াহর আযাব নাযিল হয়েছিলো তাই আদ কাওমের জন্যে সেই দিনগুলো ছিলো অমঙ্গলকর। 'প্রচন্ড ঝড়ো বাতাসের' অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষাবিদদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেন: এর অর্থ মারাত্মক 'লু' প্রবাহ; কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস যা প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচন্ড শব্দে বৃষ্টি হয়।[১৪৭]

এ বাতাস প্রচন্ড ঝড়ের আকারে এসেছিলো যা মানুষকে শূণ্যে তুলে তুলে সজোরে আছড়িয়ে ফেলেছে এবং এ অবস্থা একাদিক্রমে আট দিন ও সাত রাত পর্যন্ড় চলেছে। এভাবে আদ জাতির গোটা এলাকা তছনছ করে ফেলেছে। ফলে সবাই তারা ধ্বংসের ঘাটে এসে পতিত হয়েছিলো। না দুনিয়ায় কেউ তাদের সাহায্য করতে পারলো, না পরকালে কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে। উভয় জগতে তারা বন্ধনহীন রয়ে গেলো।[১৪৮]

আদ জাতি এমনভাবে ধ্বংস হলো যে, প্রবল বাতাসের পর দূর্বল গাছগুলো যেমন শিকড় সহ উপড়ে যায়। কুর'আনের বর্ণনায় আদ জাতির ধ্বংসের নমুনা:

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ • إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ • تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ •

"আদ জাতিও (রাসূলকে) প্রত্যাখ্যান করেছিলো। এর ফলে কেমন ছিলো আমার আযাব আর সতর্কবাণী? আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম ঝড়ো বায়ু এক বিরামহীন

১৪৬. আল কুর'আন, ৪১:১৬
১৪৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-১৪, পৃ.-১৮
১৪৮. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবন্ কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-১৬, পৃ.-৪৬৬

দুর্ভাগ্যের দিনে, সে ঝড় মানুষকে উৎখাত করে রেখে দিয়েছিল সমূলে উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ডের মতো।"[১৪৯]

ইতিহাসের ক্ষমতাধর এ জাতি রবের সাথে কুফরি করার কারণে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে বহু দূরে।

وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ • وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ •

"তারা ছিলো আদ জাতি, তারা তাদের রবের আয়াত অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর রাসূলদের অমান্য করেছিল এবং প্রত্যেক অহংকারী স্বৈরাচারীর অনুসরণ করেছিল। দুনিয়ার জীবনে তাদের অভিশাপগ্রস্ড় করা হয়েছিল এবং কিয়ামতের দিনও হবে তারা অভিশাপগ্রস্ড়। সাবধান, আদ জাতি তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল। সাবধান, নিপাত গিয়েছিল আদ জাতি, যারা ছিলো হুদের কাওম।"[১৫০]

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ •

"কতো যে জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। কারণ, সেগুলোর অধিবাসীরা ছিলো যালিম। সে সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্ড়ুপে পরিণত হয়েছিল। কতো যে কূপ পরিত্যাক্ত হয়েছিলো, আর কতো যে সুদৃঢ় প্রাসাদ।"[১৫১]

বেঁচে গেলেন সত্যানুসারীরা

অহংকারী আদ জাতি সমূলে উৎপাটিত হলেও সত্য পথের অনুসারীরা ঠিকই টিকে থাকলেন। যখন আযাবের জন্যে আল-াহর নির্দেশ নেমে এলো এবং প্রচন্ড ঝড় তুফান শুর" হলো তখন আল-াহ তা'য়ালা তাঁর অশেষ রহমতে হুদ (আ.) ও তাঁর সংগী সাথীদের যাঁরা ঈমান এনেছিলো তাঁদের রক্ষা করলেন।[১৫২]

যে প্রচন্ড বাতাস ও ঝড়-ঝঞ্ঝা আদ জাতিকে ধ্বংস করলো, আল-াহর বিশেষ কুদরতে সেই প্রচন্ড বাতাস ও ঝড়-ঝঞ্ঝা মুমিনদের জন্যে আরামদায়কে পরিণত হলো। হুদ (আ.) মুমিনদের নিয়ে একটি কুঠরীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের গায়ে ঝড়ের স্পর্শও লাগেনি। বরং মৃদু-মন্দ ও আরাম দায়ক বাতাস তারা অনুভব করেছিলেন।[১৫৩]

---

১৪৯. আল কুর'আন, ৫৪:১৮-২০
১৫০. আল কুর'আন, ১১:৫৯-৬০
১৫১. আল কুর'আন, ২২:৪৫
১৫২. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৪, পৃ.-৬২৩
১৫৩. কাযী ছানাউল-াহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০৪, পৃ.-৪৩৬

হুদ (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের মহান রাব্বুল আলামিন নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলেন। আল-াহ বলেন:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ •

"তারপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছে, আমরা হুদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের দয়ায় নাযাত দিয়েছিলাম এবং তাদের রক্ষা করেছিলাম কঠিন আযাব থেকে।"[১৫৪]

সত্য পথের যাত্রীরা শুধু এ আযাব থেকে রক্ষা পেলেন তা-ই নয়, তারা পরকালেও কামিয়াব বলে পরিগণিত হলেন।

হুদ (আ.) ও তাঁর সংগীদের যাদের সংখ্যা শেষ পর্যন্ড় চার হাজারে পৌঁছেছিলো, এ ভয়াবহ অবস্থায়ও তারা নিরাপদ থাকে এবং ঈমান ও সৎ কাজের বদৌলতে আখেরাতের কঠিন শাস্ড়ি থেকেও তাদের মুক্তি দেয়া হয়।[১৫৫]

আল কুর'আনে বর্ণিত আদ জাতির অস্ড়িত্বের প্রমাণ

সৌদি আরবের রব-উল-খালিতে (উন্মুক্ত প্রান্ড়র) ৩২ ফুট আকৃতির মানব কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত ১০ মিটার (৩১.৮০ ফুট) লম্বা কঙ্কালটি পবিত্র কুর'আনের বর্ণনায় আসা আদ জাতির দৈহিক কাঠামোর সাথে মিলে যায়। এ কঙ্কালটিকে আদ জাতির কোনো ব্যক্তির কঙ্কাল বলে মনে করছেন কুর'আন গবেষকরা। ২০০৪ সালে বহুজাতিক জ্বালানি কোম্পানি 'আরামকো' গ্যাস অনুসন্ধানের সময় কঙ্কালটিসহ ঐ এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলোর খোঁজ পায়। ঐ আবিষ্কারের পরপরই সৌদি সামরিক বাহিনী স্থানটি ঘেরাও করে রাখে এবং অনুমতি ছাড়া কাউকে সেখানে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সৌদি সামরিক বাহিনী বিমান থেকে নেয়া ঐ এলাকার কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। সৌদি আরবের গবেষকরা জানিয়েছেন, ঐ প্রান্ড়রে পাওয়া নমুনাগুলো আদ জাতির ধ্বংসাবশেষ।

কুর'আন থেকে জানা যায়, আদ জাতির লোকেরা খুব লম্বা, বিশাল ও অত্যন্ড় শক্তিশালী ছিলো। তারা এতো শক্তিধর ছিলো যে এক হাতেই বড় বড় বৃক্ষ উপড়ে ফেলতে পারতো। প্রাপ্ত বিশাল এ কঙ্কালটি কুর'আনের দেয়া তথ্যেরই প্রমাণ দিচ্ছে। আল-াহর বিধান না মানার কারণেই আদ জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। আজ এ কঙ্কালটি সেই ইতিহাসেরই সাক্ষ্য বহন করছে।[১৫৬]

---

১৫৪. আল কুর'আন, ১১:৫৮

১৫৫. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০২, পৃষ্ঠা-৩৫২

১৫৬. www.facebd.net

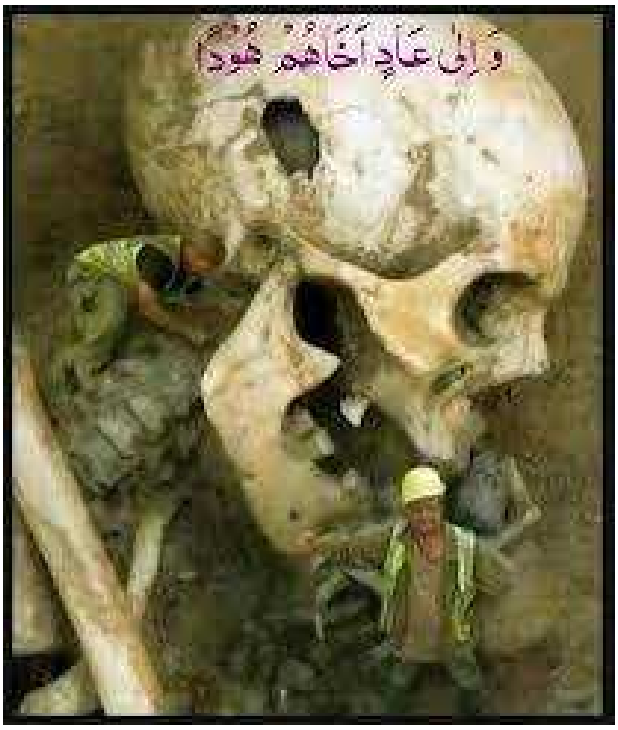

আদ জাতির কঙ্কাল

সৌদি আরবের রব-উন-খালিতে প্রাপ্ত ৩২ ফুট লম্বা আদ জাতির কঙ্কাল

আদ জাতির আযাব: পরবর্তীদের জন্যে একটি দৃষ্টান্ড়

আদ জাতি শুধু দুনিয়ার এ আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো তা-ই নয়, তারা পরকালেও লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত বলে পরিগণিত হলো।

আদ জাতি ঐ লোকদেরই মেনে চলতো যারা ছিলো তাদের মধ্যে একগুঁয়ে ও ঔদ্ধত। তাদের ওপর আল-াহর এবং তাঁর মুমিন বান্দাদের লা'নত বর্ষিত হলো। এ দুনিয়াতেও তাদের নিয়ে আলোচনা হয় লা'নতের সাথে এবং কিয়ামতের দিন ও হাশরের মাঠে সবার সামনে তাদের ওপর আল-াহর লা'নত বর্ষিত হবে।[১৫৭]

আর তারা এমন লোকের কথামত কাজ করেছে, যারা ছিলো অহংকারী, হঠকারী। (যার ফলে) এ দুনিয়াতে (আল-াহর) অভিশম্পাত তাদের পেছনে পেছনে রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও তাদের সাথে অভিশম্পাত থাকবে। যার ফলে ঝড়-তুফানের কবলে পড়ে দুনিয়া হতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং আখেরাতেও তারা চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করবে।[১৫৮]

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর আদ জাতি নির্মমভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো। তারা তাদের শারীরিক শক্তি, অহংকার, প্রশাসনিক ক্ষমতা ইত্যাদিকে চূড়ান্ড় শক্তি মনে করে হুদ (আ.) এর দা'ওয়াতকে প্রত্যাখান করেছিলো। তারা মনে করেছিলো তারাই সঠিক পথে রয়েছে। কিন্তু আল-াহর সিদ্ধান্ড় যখন এসে গেলো তখন তাদের গায়ের জোর, অর্থ-বিত্ত, সৈন্য-সামন্ড় সবকিছুই ভূলণ্ঠিত হলো। মহান রাব্বুল আলামিনের প্রচন্ড ক্ষমতার বিপরীত তাদের কিছুই করার ছিলো না। অন্যদিকে সত্য পথের অনুসারীরা এ ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন। সঠিক দীনের ওপর থাকার কারণেই তারা সফল হলেন দুনিয়া ও আখেরাতে। নিজেদের স্থান করে নিলেন সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে যা আকাশ ও পৃথিবী সমান বিস্ড়ৃত।

---

১৫৭. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবন্ কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-১২, পৃ.: ৮১

১৫৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-৪, পৃ.-৬২৪

৩য় পরিচ্ছেদ

সামুদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীঃ মাদায়েনে সালেহ

সামুদ জাতির পরিচয়

আদ জাতির ধ্বংসের পর যাদেরকে তাদের নেক আমলের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা রক্ষা করেছিলেন, তারা হযরত হুদ (আ.) এর শিক্ষাদীক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে থাকে। কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহেলিয়াতের খপ্পরে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন। আবার ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্বসংঘর্ষ শুর‍ু হয়।

আরবের প্রাচীনতম জাতিগুলোর খ্যাতির দিক দিয়ে আদ জাতির পরেই সামুদ জাতির অবস্থান। সামুদ জাতি আদ জাতিরই পরবর্তী শাখা। আদ জাতির ধ্বংসের পর কালক্রমে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় সামুদ জাতি। জাহেলি যুগের কবিতা ও ভাষণের মধ্যে সামুদ জাতির উলে- খ করা হতো। আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং গ্রীস, আলেক জান্দ্রিয়া ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসেও তাদের উলে- খ পাওয়া যায়।[১৫৯]

সামুদ জাতির বাসস্থান

সামুদ জাতি উত্তর-পশ্চিম আরবের 'হিজর' শহরে বাস করতো। বর্তমান কালে মদিনা এবং তাবুকের মধ্যে স্থাপিত হেজায রেলওয়ের একটি স্টেশনের নাম 'মাদায়েনে সালেহ'। এটিই ছিলো সামুদ জাতির বাসস্থান এবং প্রাচীনকালে একেই বলা হতো 'হিজর'। এখনো সেখানে হাজার হাজার একর জুড়ে প্রস্ড়র নির্মিত দালান কোঠা দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো সামুদ জাতির লোকেরা পাহাড় খোদাই করে বানিয়েছিলো। এ শহরটি দেখলেই অনুমান করা যায়, কোনো এক সময়ে এ শহরের জনসংখ্যা চার পাঁচ লক্ষের কম ছিলো না।

সামুদ জাতির নৈতিক অধ:পতন

আল কুর'আনের বর্ণনায়[১৬০] জানা যায়, আদ জাতির পরে সামুদ জাতিই দুনিয়ায় উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিলো। কিন্তু তাদের সভ্যতার অগ্রগতিও শেষ পর্যন্ড় আদ জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির মতো একই রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর এবং মনুষ্যত্বের মান নিম্নতর থেকে নিম্নতর হতে থাকে। একদিকে সমতল এলাকায় সুউচ্চ ও সুরম্য অট্টালিকা এবং পার্বত্য এলাকায় অজন্ড়া-ইলোরবে পর্বত গুহার মতো সুরম্য প্রাসাদ নির্মিত হতে থাকে। আর অন্যদিকে সমাজে শিরক ও মূর্তি পূজার প্রবল জোয়ার চলতে থাকে। পৃথিবী ভরে উঠতে থাকে প্রচন্ড যুলম আর নিপীড়নে। জাতির সবচেয়ে অসৎ দুস্কৃতিকারীরা নেতৃত্বের আসনে ছিলো। সমাজের উচু শ্রেণির লোকেরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত ছিলো।

---

১৫৯. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮

১৬০. আল কুর'আন, ০৭:৭৩-৭৯, ১১:৬১-৬৮, ১৫:৮০-৮৪, ১৭:৫৯

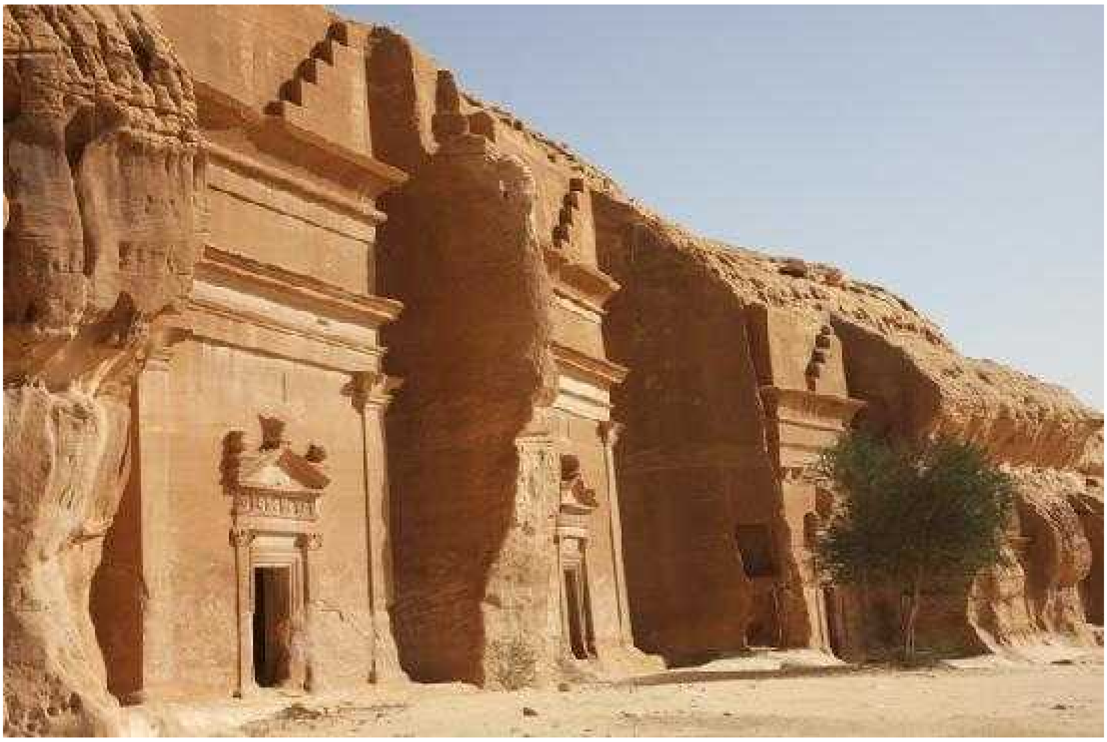

মাদায়েনে সালেহে সামূদীয় অট্টালিকা

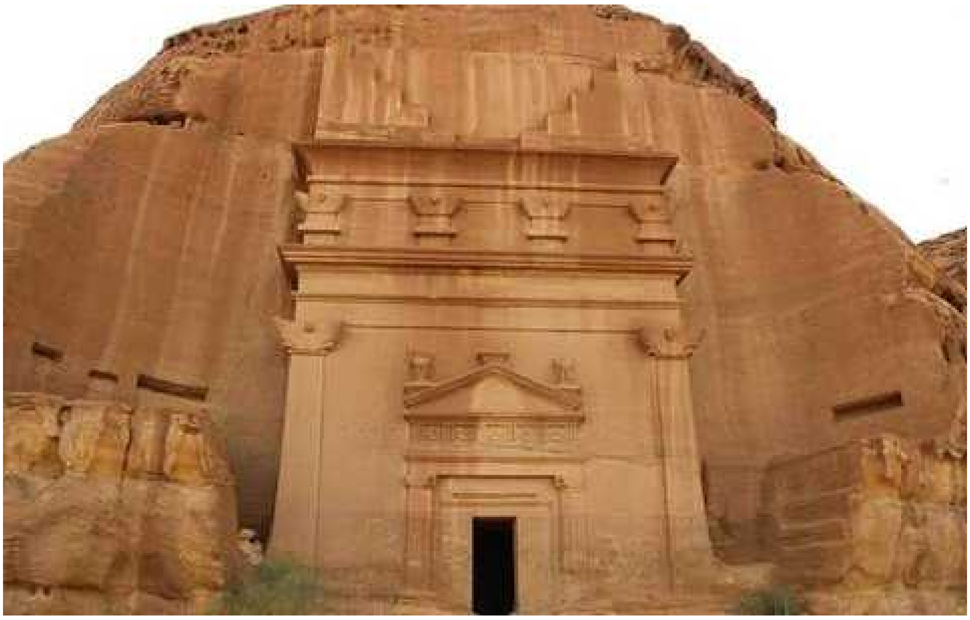

মাদায়েনে সালেহে সামূদীয় অট্টালিকা

সামুদ জাতির প্রতি সালেহ (আ.) এর দা'ওয়াত ও তাদের প্রত্যাখ্যান

সামুদ জাতির প্রতি আল-াহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী ছিলেন হযরত সালেহ (আ.)। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সত্যের পথে আহ্বান করেন।

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ •

"আর সামুদের কাছে পাঠাই তাদের ভাই সালেহকে। তিনি বলেন! হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল-াহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে।[১৬১]

হযরত সালেহ (আ.) এর সত্যের দা'ওয়াত কেবলমাত্র নিু শ্রেণির দূর্বল লোকদেরকেই প্রভাবিত করেছিলো। উচু শ্রেণির লোকেরা এ দা'ওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলো।

সামুদ জাতির লোকেরা মূলত তিনটি কারণে হযরত সালেহ (আ.) এর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো।

প্রথমত. তিনি মানব সত্ত্বার উর্ধ্বে নন।
দ্বিতীয়ত. তিনি তাদের কাওমেরই একজন মানুষ ছিলেন।
তৃতীয়ত. তিনি সাধারণ একজন মানুষ।

সামুদ জাতির মতে নবী হবে এমন একজন যিনি উপর থেকে নেমে আসবেন অথবা বাইরে থেকে আসবেন। তাঁর সাথে সৈন্য সামন্ড় ও সেবক-সেবিকা থাকতে হবে। তাঁর অস্বাভাবিক শান শওকত ও জাঁকজমক থাকবে। সালেহ (আ.) এগুলোর অন্ড় র্ভুক্ত ছিলেন না বলে তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়নি।[১৬২]

---

১৬১. আল কুর'আন, ০৭:৭৩
১৬২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-১৬, পৃ.-৫৪

মু‘জিযা প্রদর্শনের দাবি ও সিদ্ধান্ড়কর নিদর্শন

সামুদ জাতির লোকেরা নিজেরাই হযরত সালেহের কাছে এমন একটি নিদর্শনের দাবি করছিলো যা আল-াহর পক্ষ থেকে নিযুক্তির দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর জবাবে হযরত সালেহ (আ.) মু‘জিযা হিসেবে একটি উট হাজির করেন।

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ • وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ •

“আমরা তাদের পরীক্ষার জন্যে পাঠালাম এই উট। সুতরাং তুমি এর ব্যাপারে তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করো এবং সবর করো। তাদের তুমি সংবাদ দাও, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নিজ নিজ ভাগের পানির জন্যে প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে।”[১৬৩]

وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ •

“হে আমার কাওম! এটি আল-াহ্‌র উটনী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। তোমরা এটিকে আল-াহ্‌র জমিনে চরে খেতে দাও। তোমরা এটিকে মন্দ (উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করো না, করলে তোমাদের উপর আপতিত হবে আশু আযাব।”[১৬৪]

সামুদ জাতি স্বয়ং হযরত সালেহের কাছে নিদর্শন চেয়েছিলো, যাতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল-াহর নবী। সেই দাবীর জবাবেই সালেহ (আ.) উট হাজির করেছিলেন। সুতরাং উটটি যে মু‘জিযা স্বরূপই এসেছিলো, তা সত্য। অন্যান্য বহু নবী অবিশ্বাসীদের জবাবে আপন নবুয়্যাতের প্রমাণ হিসেবে যেসব মু‘জিযা দেখাতেন, এটি সে ধরনেরই একটি মু‘জিযা। হযরত সালেহ (আ.) অবিশ্বাসীদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, উটটির বেঁচে থাকার ওপর তোমাদের জীবন নির্ভরশীল। এ হুঁশিয়ারী থেকে প্রমাণিত হয় যে, উটটির জন্ম হয়েছিলো মু‘জিযার আকারে।[১৬৫]

সামুদ জাতির সামনে হঠাৎ একটি উট এনে বলে দেয়া হলো, ‘একদিন এটি একা পানি পান করবে এবং অন্যদিন সমগ্র জাতির যতো পশু আছে সবাই পানি পান করবে। আর তোমরা যদি তার গায়ে কোনোভাবে হাত উঠাও তাহলে আকস্মাত তোমাদের ওপর আল-াহর আযাব নেমে আসবে।’ অনেক দিন পর্যন্ড় ঐ উটটির পানি পানের নির্দিষ্ট

---

১৬৩. আল কুর’আন, ৫৪:২৭-২৮

১৬৪. আল কুর’আন, ১১:৬৪

১৬৫. হযরত সালেহ (আ.) এর উটের মু‘জিযা, *ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনা*, (https://mobile.facebook.com)

দিনে কেউ পানির কাছে যাওয়ার সাহস করতো না। সামুদ জাতি এ উটকে ভয় পেতো এবং তারা জানতো এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো শক্তি আছে।

সামুদ জাতির লোকেরা যে কূপ থেকে পানি পান করতো ও তাদের গবাদি পশুদের পানি পান করাতো, এ উটটিও সেই কূপ থেকেই পানি পান করতো। উটটি যেদিন পানি পান করতো, সেদিন কূপের পানি নিঃশেষে পান করে ফেলেতো। ঐদিন লোকেরা উটটির দুধ পান করতো এবং বাকি দুধ দ্বারা তারা তাদের সব পাত্র ভরে নিতো। কিন্তু এ হতভাগাদের কপালে এতো সুখ সহ্য হলো না। তারা একদিন পানি না পাওয়াকে অসুবিধার কারণ হিসেবে গণ্য করলো। ফলে তারা উটটিকে মেরে ফেলতে মনস্থ করলো।[১৬৬]

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ •

“অতঃপর তারা সেই উটনিকে হত্যা করে, আর অবাধ্য হয় আল-াহ্‌র আদেশের এবং বলেঃ ‘হে সালেহ্! তুমি যদি একজন রাসূলই হয়ে থাকো, তবে যে শাস্ড়ির ভয় আমাদের দেখিয়েছো তা নিয়ে আসো।”[১৬৭]

উটকে মেরে ফেলার মাধ্যমে সামুদ জাতি আল-াহর হুকুম অমান্য করলো এবং আল-াহর দরবারে অপরাধী প্রমাণিত হলো।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ • فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ • إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ •

“তারপর তারা তাদের এক সাথিকে ডাকলো, সে দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং ওটিকে হত্যা করে ফেললো। এবার দেখো, কী কঠোর ছিলো আমার আযাব এবং আমার সতর্কবাণী! আমরা তাদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম এক প্রচ শব্দের আযাব, তাতেই তারা হয়ে পড়লো শুকনো মোড়ানো খড়ের কাঁদির মতো।”[১৬৮]

---

১৬৬. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল-াহ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী* (হযরত সালেহ (আ.) www.at-tahreek.com)

১৬৭. আল কুর’আন, ০৭:৭৭

১৬৮. আল কুর’আন, ৫৪:২৯-৩১

হযরত সালেহ (আ.)-এর বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিকারীদের ষড়যন্ত্র ও আল-াহর প্রেরিত আযাব

উটটির হত্যার ঘটনার পর সালেহ (আ.) তাঁর কাওমকে আল-াহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন।

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ •

"কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করে। তখন সে তাদের বলেছিল: 'তোমরা তোমাদের ঘরে মাত্র তিনদিন উপভোগ করো। এটি একটি অনিবার্য সত্য ওয়াদা।"[১৬৯]

কিন্তু এ হতভাগারা এরূপ কঠোর হুঁশিয়ারির কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বরং তাচ্ছিল্যভাবে তাদের রাসূলকে বললো:

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ •

"অতঃপর তারা সেই উটনিকে হত্যা করে, আর অবাধ্য হয় আল-াহ্র আদেশের এবং বলে: 'হে সালেহ্! তুমি যদি একজন রাসূলই হয়ে থাকো, তবে যে শাস্তির ভয় আমাদের দেখিয়েছো তা নিয়ে আসো।"[১৭০]

তারা বললো, আমরা জানতে চাই, এ শাস্তি কিভাবে আসবে, কোত্থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে? সালেহ (আ.) বললেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের সকলের মুখমন্ডল হলুদ হয়ে যাবে। পরেরদিন শুক্রবার তোমাদের সবার মুখমন্ডল লাল বর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমন্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।[১৭১]

এ কথা শোনার পর হঠকারী জাতি আল-াহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে সালেহ (আ.)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ভাবলো, যদি আযাব এসেই যায়, তবে তার আগে একেই শেষ করে দেই। কেননা, এর নবুওয়্যাতকে অস্বীকার করার কারণেই গযব আসছে। অতএব এই ব্যক্তিই গযবের জন্যে মূলতঃ দায়ী। আর যদি গযব না আসে, তাহলে সে মিথ্যার দন্ড ভোগ করুক। কাওমের নয়জন নেতা এ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দেয়। তাদের এ চক্রান্তের বিষয় পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

---

১৬৯. আল কুর'আন, ১১:৬৫

১৭০. আল কুর'আন, ০৭:৭৭

১৭১. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৩, পৃ.-৩৩৫

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ • قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّـهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ •

"সেই শহরে ছিলো নয় ব্যক্তি যারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতো এবং সংশোধন হতো না। তারা বলেছিল: 'তোমরা নিজেদের মধ্যে আল-াহ্র নামে কসম খেয়ে বলো: আমরা অবশ্যি রাতের বেলায় তাকে (সালেহ্কে) এবং তার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করে হত্যা করবো, তারপর তার অলিকে বলবো: তার পরিবারবর্গকে কারা হত্যা করেছে তা আমরা দেখি নি। আমরা অবশ্যি সত্যবাদী।"[১৭২]

তারা যুক্তি দিলো, আমরা আমাদের কথায় অবশ্যই সত্যবাদী প্রমাণিত হবো। কারণ রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানতে পারবো না। নেতৃবৃন্দের এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ড় ও চক্রান্ড় অনুযায়ী নয়জন নেতা তাদের প্রধান ক্বাদার ইবন্ সালেফের নেতৃত্বে রাতের বেলা সালেহ (আ.)-কে হত্যা করার জন্যে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল-াহ তা'য়ালা পথিমধ্যেই তাদেরকে প্রস্ড়র বর্ষনে ধ্বংস করে দিলেন।

মহান আল-াহ বলেন:

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ • فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ •

"তারা এ জঘন্য চক্রান্ড় করেছিল, আর এদিকে আমিও করেছি একটি কৌশল যা তারা টেরই পায়নি। অতঃপর লক্ষ্য করে দেখো তাদের চক্রান্ড়ের পরিণতি কী হয়েছে, আমি তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি।"[১৭৩]

তারা উটকে হত্যা করার পর সালেহ (আ.) এর উপর আক্রমণ করার এক পরিকল্পনা করলো। কিন্তু এর আগেই আল-াহ তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন।

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ •

"আর তাদের গ্রাস করলো আযাব। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন, আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিলো না।"[১৭৪]

উটকে মেরে ফেলার পর হযরত সালেহ ঘোষণা করেন:

---

১৭২. আল কুর'আন, ২৭:৪৮-৫১
১৭৩. আল কুর'আন, ২৭:৫০-৫১
১৭৪. আল কুর'আন, ২৬:১৫৮

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ •

“কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করে। তখন সে তাদের বলেছিল: ‘তোমরা তোমাদের ঘরে মাত্র তিনদিন উপভোগ করো। এটি একটি অনিবার্য সত্য ওয়াদা।”[১৭৫]

এ ঘোষণার মেয়াদ শেষ হবার পর রাতের শেষ প্রহরে ভোরের কাছাকাছি সময়ে একটি প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটে। সেদিন ছিলো রবিবার। ঐ লোকগুলো সুগন্ধি মেখে শাস্ড়ির অপেক্ষা করছিলো, তাদের উপর সেটা কি আকারে আসবে! সূর্য উদিত হলো এবং আকাশ থেকে এক ভীষণ শব্দ বেরিয়ে আসলো। পায়ের নীচ থেকে এক কঠিন ভূমিকম্প শুর— হয়ে গেলো। সকাল হবার পর চারদিকে লাশের পর লাশ এমনভাবে ছড়িয়ে পদদলনে বিধ্বস্ড় ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাদের সুরম্য প্রাসাদ এবং পার্বত্য গুহাগুলো তাদেরকে এ ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কালবা বিনতে সালাক নামের এক মহিলা বেঁচে গেলো। সে নবী সালেহ (আ.) এর ভীষণতম শত্র— ছিলো। সে শাস্ড়ি অবলোকন করে দ্র—তবেগে পলায়নের শক্তি লাভ করলো। একটি গোত্রের নিকট পৌঁছে যা কিছু সে দেখেছিলো তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিলো। সমস্ড় কওম কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো তারও সে আলোচনা করলো। তারপর সে পান করার জন্যে পানি চাইলো। পানি পান করা মাত্রই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।[১৭৬]

নির্ধারিত দিনে গযব নাযিল হওয়ার প্রাক্কালেই আল-াহর হুকুমে হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় ঈমানদার সাথীগণকে নিয়ে এলাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় তিনি স্বীয় কাওমকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ •

“তখন সে (সালেহ্) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল: ‘হে আমার কাওম! আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের জন্যে কল্যাণকর নসিহত করেছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না।”[১৭৭]

রক্ষা পেলো ঈমানদারগণ

১৭৫. আল কুর’আন, ১১:৬৫
১৭৬. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৮, পৃ.-৩৩৮
১৭৭. আল কুর’আন, ০৭:৭৯

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ •

"অতঃপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছালো আমরা আমাদের অনুগ্রহে সালেহ্ এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদের রক্ষা করলাম সেদিনের চরম লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয়ই তোমার রব মহাশক্তিধর পরাক্রমশালী।"[১৭৮]

সিনাই উপদ্বীপে প্রচলিত কিংবদন্ত্মী অনুসারে জানা যায়, যখন সামূদ জাতির ওপর আযাব আসে তখন হযরত সালেহ (আ.) হিযরত করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এ জন্যেই "হযরত মূসার পাহাড়ের" কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের নাম "নবী সালেহের পাহাড়" এবং কথিত আছে যে, এখানেই তিনি অবস্থান করেছিলেন।[১৭৯]

মাদায়েনে সালেহে সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ

সামুদ জাতির সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিলো, তারা পাহাড় খোদাই করে তার মধ্যে অট্টালিকা নির্মাণ করতো। আর এসব কিছু তারা করেছিলো গর্ব-অহংকার, সম্পদ-শক্তি ও স্থাপত্য শিল্পের প্রদর্শনীর জন্যে। কিন্তু আল-াহর প্রেরিত আযাবে তাদের সমস্ত্ম অহংকার মুহূর্তেই ধ্বংসে রূপ নেয়।

সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ মদিনার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান শহর "আল-উলা" থেকে কয়েক মাইল ব্যবধানে দেখতে পাওয়া যায়। মদিনা থেকে তাবুক যাবার পথে এ স্থানটি প্রধান সড়কের উপরেই পাওয়া যায়। কুর'আন নাযিল হওয়ার সময়কালে হেজাযের ব্যবসায়ী কাফেলা এ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতো।

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল-াহ (সা.) যখন এই এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি মুসলিমদেরকে এ শিক্ষণীয় নিদর্শনগুলো দেখান এবং এমন শিক্ষা দান করেন যা এ ধরনের ধ্বংসাবশেষ থেকে একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এক জায়গায় তিনি একটি কুয়ার দিকে আংগুলি নির্দেশ করে বলেন, এ কুয়াটি থেকে হযরত সালেহের উট পানি পান করতো। তিনি মুসলিমদেরকে এ কুয়াটি থেকে পানি পান করতে বলেন। একটি গিরিপথ দেখিয়ে তিনি বলেন, এ গিরিপথ দিয়ে হযরত সালেহের উটটি পানি পান করতে আসতো। তাই সেই স্থানটি আজো "ফাজ্জুন নাকাহ" বা উটের পথ নামে খ্যাত হয়ে আছে। তাদের ধ্বংসস্ত্মূপগুলোর মধ্যে যেসব মুসলিম ঘোরাফেরা করছিলো তাদেরকে একত্র করে তিনি একটি ভাষণ দেন। এ

---

১৭৮. আল কুর'আন, ১১:৬৬

১৭৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০৬, পৃ.-৪০

ভাষণে সামূদ জাতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, "এটি এমন একটি জাতির এলাকা যাদের ওপর আল-াহর আযাব নাযিল হয়েছিলো। তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া কোনো অবস্থাতেই এসব শাস্ড়িপ্রাপ্ত কওমের পাশ দিয়ে গমন করো না। যদি তোমরা ক্রন্দনকারী না হও তবে তাদের মধ্যে প্রবেশ করো না, নতুবা তাদের প্রতি যে শাস্ড়ি পৌঁছেছিলো তা তোমাদের ওপরও পৌঁছে যাবে।"[১৮০]

১৮০. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৮, পৃ.-৩৩৩

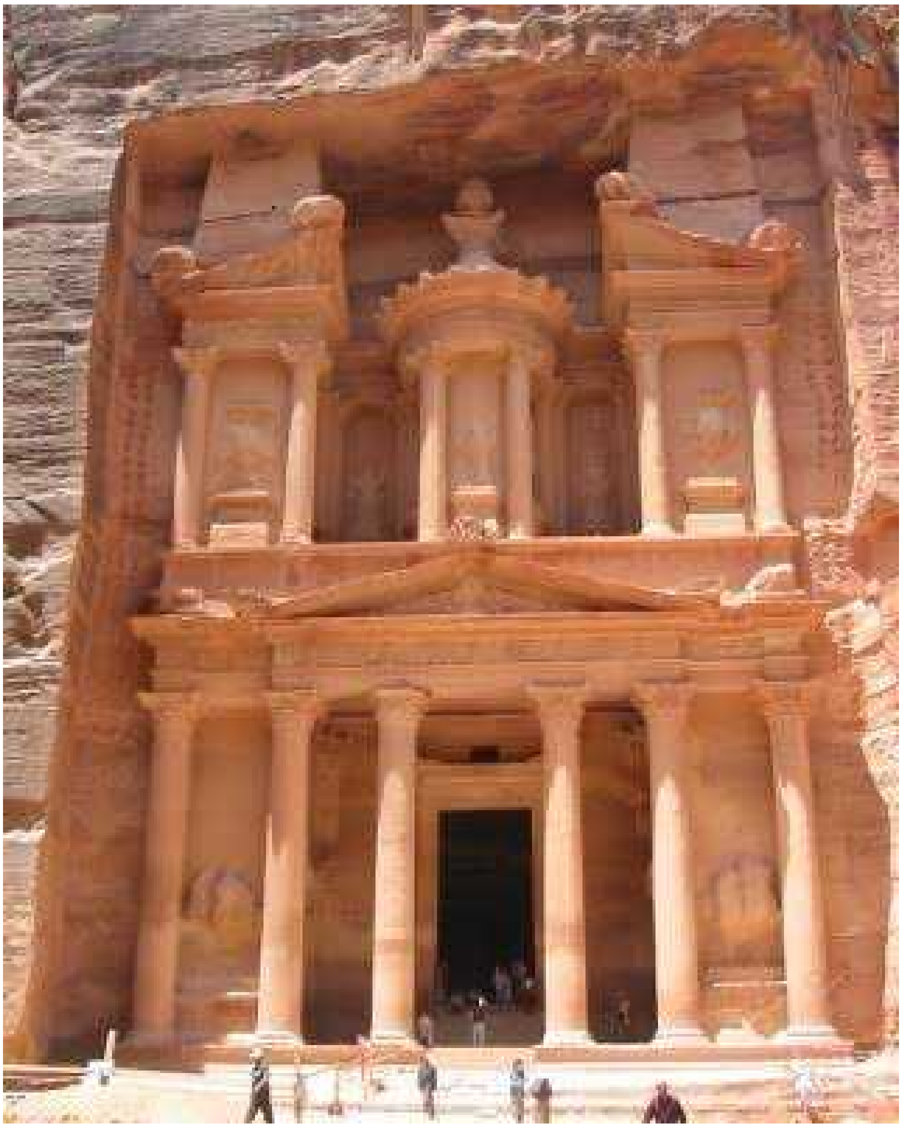

মাদায়েনে সালেহে সামূদীয় অট্টালিকা

মাদায়েনে সালেহে সামূদীয় অট্টালিকা

মাদায়েনে সালেহে সামূদীয় অট্টালিকা

হিজরী আট শতকে পর্যটক ইবনে বতুতা হজ্জে যাবার পথে এখানে এসে পৌঁছেন। তিনি লেখেন: এখানে লাল রংয়ের পাহাড়গুলোতে সামুদ জাতির ইমারতগুলো রয়েছে। এগুলো তারা পাহাড় কেটে কেটে তার মধ্যে নির্মাণ করেছিলো। এ গৃহগুলোর কারুকাজ এখনো এমন উজ্জ্বল ও তরতাজা আছে যেন মনে হয় আজই এগুলো খোদাই করা হয়েছে। পচা গলা মানুষগুলোর হাড় এখনো এখানকার ঘরগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়।[১৮১]

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মাদায়েনে সালেহ' প্রত্যক্ষ করে এসে এর বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"এ জায়গাটি মদিনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী হিজাযের বিখ্যাত 'আল উলা' নামক স্থান (যাকে নবীর যুগে 'ওয়াদিউল কুরা' বলা হতো) থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা আজো এ জায়গাকে 'আল্ হিজ্‌র' ও 'মাদ্‌য়ানে সালেহ' নামে স্মরণ করে থাকে। এ এলাকায় 'আল উলা' এখনো একটি শস্যশ্যামল উপত্যকা। এখানে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পানির নহর ও বাগিচা। কিন্তু আল হিজরের আশেপাশে বড়ই নির্জন ও ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। লোকবসতি নামমাত্র। সবুজের উপস্থিতি ক্ষীণ। কূয়া আছে কয়েকটি। এরই মধ্যে একটি কূয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একথা প্রচলিত আছে যে, হযরত সালেহ (আ.) এর উট সেখান থেকে পানি পান করতো। বর্তমানে এটি তুর্কী আমলের একটি বিরান ক্ষুদ্র সামরিক চৌকির মধ্যে অবস্থিত। কূয়াটি একেবারেই শুকনা। এ এলাকায় প্রবেশ করে 'আল উলা'র কাছাকাছি পৌঁছতেই আমরা সর্বত্র এমনসব পাহাড় দেখলাম যা একেবারেই ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পরিষ্কার মনে হচ্ছিলো, কোনো ভয়াবহ ভূমিকম্প এগুলোকে নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত ঝাঁকুনি দিয়ে ফালি ফালি করে ফেলেছে। এ ধরনের পাহাড় আমরা দেখতে দেখতে গিয়েছি পূর্ব দিকে 'আল উলা' থেকে খায়বার যাবার সময় প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্দান রাজ্যের সীমানার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত। এর অর্থ দাঁড়ায়, তিন চারশো মাইল দৈর্ঘ ও একশো মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একটি এলাকা ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।"[১৮২]

---

১৮১. প্রাগুক্ত, খন্ড-০৭, পৃ.-২৩
১৮২. প্রাগুক্ত, খন্ড-১০, পৃ.-১০৮

সামুদ জাতির ধ্বংসস্তুপের নিদর্শন থেকে সহজেই বোঝা যায়, পৃথিবীতে বিপর্যয়কারী জাতিদের কি ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে! মানবজাতির জন্যে এতে রয়েছে এক বিরাট শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ।

দুনিয়ায় সামুদ জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করলেও তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে তাদের উন্নত সভ্যতা। তাদের সীমালংঘন তাদেরকে চূড়ান্ড়ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি কোনো কিছুই।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বিকৃত পাপে অভিশপ্ত লূত জাতি ও ঐতিহাসিক মৃতসাগর (DEAD SEA)

হযরত সালেহ (আ.) -এর পর আরো কতিপয় নবীর আগমণ হয় এবং প্রত্যেকের সাথে তাঁদের জাতির লোকেরা একই আচরণ করে। অর্থাৎ সত্যের দা'ওয়াত তারা প্রত্যাখ্যান করে। নবীগণকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে এবং তাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালাতেও দ্বিধাবোধ করেনি। অবশেষে হযরত লূত (আ.)-এর আগমণ হয়। পূর্ববর্তী নবীগণ যেসব বাধাবিঘ্ন, প্রতিবন্ধকতা, ঠাট্টাবিদ্রূপ ইত্যাদির সম্মুখিন হন, হযরত লূত (আ.)-কেও সে সবের সম্মুখিন হতে হয়। আর তা ছিলো সমাজে প্রচলিত ব্যাপক সমকামিতা। তাদের মতবাদের সারমর্ম হলো, কর্মের স্বাধীনতাকে নৈতিক শৃংঙ্খলে আবদ্ধ করা যেতে পারে না।

লূত জাতি স্বাধীনতার এ পাশবিক মতবাদ দৃঢ় প্রত্যয়সহ গ্রহণ করে যার ফলে তারা ঘৃণ্য নৈতিক পংকিলতায় নিমজ্জিত হয়েছিলো। হযরত লূত (আ.) শিরক-কুফর খন্ডনের সাথে সাথে তাদের এ ঘৃণ্য রুচিবোধেরও তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু তারা লূত (আ.) এর এসব কথায় মোটেই কর্ণপাত করেনি।[১৮৩]

হযরত লূত (আ.) এর পরিচয়

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী নাহূরা ও হারান নামে হযরত ইবরাহিমের দুই ভাই ছিলো। হযরত লূত ছিলেন হারানের ছেলে।[১৮৪]

সূরা আনকাবুতে হযরত ইবরাহিমের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বাহ্যত এ কথাই জানা যায় যে, তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে একমাত্র হযরত লূতই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর ভাইয়ের ছেলে। তাঁর শৈশবকাল ইবরাহিম (আ.) এর ছত্রছায়ায়ই কেটেছে। তিনি তাঁর চাচার সাথে ইরাক থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং শাম, ফিলিস্তিন ও মিশরে ভ্রমণ করে দা'ওয়াত ও তাবলিগের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকেন। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর তিনি সাদুম অঞ্চলের পথভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথে আনার কাজ শুরু করেন। এ জাতি লূত জাতি নামে অভিহিত। সামুদবাসীদেরকে তাঁর জাতি এজন্যে বলা হয় যে, সম্ভবত লূত (আ.) এর সাথে ঐ জাতির আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো।[১৮৫]

---

১৮৩. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-২০

১৮৪. *ওল্ডটেষ্টামেন্ট আদি পুস্তক*, অধ্যায়-১১, স্তোত্র-২৬।

১৮৫. নাজিবুল্লাহ, *সমকামিতার উৎপত্তি ও পরিণতি*, (www.amarblog.com, ২৮ আগস্ট, ২০১২)

লূত জাতির এলাকা ও মৃত সাগর

লূত জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটি বর্তমানে 'মরু সাগর বা মৃত সাগর' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'Dead Sea' এবং আরবিতে এটি 'বাহলুল মায়্যিত' নামে পরিচিত। প্রায় ২০ লাখ বছর আগে এ সাগরের উৎপত্তি। জর্ডান নদীর সংগে এর একটি সংযোগ বিদ্যমান থাকলেও এটি মূলত একটি হ্রদ। এ সাগরের দৈর্ঘ্য ৬৭ কিলোমিটার, প্রস্থ ১৮ কিলোমিটার এবং গভীরতা ১,২৪০ ফুট। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪২২ মিটার নীচে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর নিম্নতম স্থলভূমি।[১৮৬]

বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্রান্স জর্ডান বলা হয় সেখানেই ছিলো এ জাতিটির বাস। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এই এলাকাটি অবস্থিত। এখান থেকে জেরুজালেম নগরীর দূরত্ব মাত্র ১৫ মাইল। বাইবেলে 'সাদুম'-কে এ জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মরু সাগর/ মৃত সাগরের (Dead Sea) নিকটবর্তী কোথাও এর অবস্থান ছিলো। তালমূদে বলা হয়েছে, সাদূম ছাড়া তাদের আরো চারটি বড় বড় শহর ছিলো। এ শহরগুলোর মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ এমনই শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করতো। কিন্তু আজ এ জাতির নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাদের জনপদগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিলো তাও আজ সঠিকভাবে জানা যায় না। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে।[১৮৭]

হেজায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিশর যাবার পথে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকাটি পড়ে। সাধারণত বাণিজ্য যাত্রীদল এ ধ্বংসের নিদর্শনগুলো দেখে থাকে। আজও সমগ্র এলাকা জুড়ে এ ধ্বংসাবশেষগুলো ছড়িয়ে আছে। এ এলাকাটির অবস্থান মৃত সাগরের (Dead Sea) পূর্ব ও দক্ষিণে। বিশেষ করে এর দক্ষিণ অংশ সম্পর্কে ভূগোলবিদগণের বর্ণনা হচ্ছে, এ এলাকাটি এতো বেশি বিধ্বস্ত যার নযীর দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না।[১৮৮]

মরু সাগর/ মৃত সাগরে সহজেই পানির ওপরে ভেসে থাকা যায়। কারণ এর পানির ঘনত্ব অস্বাভাবিক, অন্যান্য সাগরের চেয়ে এ সাগরের লবণাক্ততার পরিমাণ ৮.৬ গুণ বেশি।

---

১৮৬. ড: আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন, আল-াহর গজবের ঐতিহাসিক সাক্ষী মৃত সাগর (অনলাইন পত্রিকা: *ইসলাম ও আমরা*, ২৯ জুন, ২০১২)

১৮৭. নাজিবুল-াহ, প্রাগুক্ত

১৮৮. প্রাগুক্ত

আর এ মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে এর পানিতে যেমন কোনো জীবন্ড় প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি এর আশে পাশে পশুরাও জীবন ধারণ করতে সক্ষম নয়। আর এ কারণেই এর নাম মৃত সাগর। ফেরাউনের আমলে এ সাগরের লবণ দিয়ে মিশরীয়রা মমীর মলম তৈরি করতো। আর এ থেকে আহরিত পটাশকে সার হিসেবে ব্যবহার করতো। এ সাগরের লবণ ও অন্যান্য খনিজ সেই আদিকাল থেকে প্রসাধনী ও হারবাল তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

লূত জাতির নৈতিক অধঃপতন

০১. কুর'আনের বর্ণনায় লূত জাতির অধঃপতনঃ

লূত জাতি যে কি ভয়াবহ অধঃপতনের নিমজ্জিত ছিলো তা কুর'আনের বিভিন্ন বর্ণনায় ফুটে উঠেছে:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ •

"আর তোমরা বর্জন করছো তোমাদের স্ত্রীদের, যাদেরকে তোমাদের রব তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা এক চরম সীমালজ্ঘনকারী কাওম।"[১৮৯]

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ •

"স্মরণ করো লুতের কথা, তিনি তাঁর কাওমকে বলেছিলেন: 'তোমরা এমন ফাহেশা কাজ করছো, যা তোমাদের আগে জগতের কেউ করেনি।"[১৯০]

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ •

"তোমরা কি পুর"ষের সাথে যৌন মিলন করে যাবে? জনপথে ডাকাতি করে যাবে? আর জনসম্মুখে অসৎকাজ করতে থাকবে?' এর জওয়াবে তার কাওম একথাই বলেছিল: 'তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে আমাদের প্রতি আল-াহ্র আযাব এনে দেখাও।"[১৯১]

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ •

"তোমরা যৌন তৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুর"ষদের কাছে যাচ্ছো। তোমরা তো এক চরম সীমালংঘনকারী জাতি।"[১৯২]

---

১৮৯. আল কুর'আন, ২৬:১৬৬

১৯০. আল কুর'আন, ২৯:২৮

১৯১. আল কুর'আন, ২৯:২৯

০২. তালমূদের বিবরণে লূত জাতির অধঃপতনের উদাহরণ:

তালমূদে এ জাতির যে অবস্থা লিখিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো। এ থেকে এ জাতিটির নৈতিক অধঃপতন কোন্ প্রান্ড় সীমা পৌঁছে গিয়েছিলো তা বুঝা যাবে। তালমূদে বলা হয়েছে: একবার আইলাম এলাকার একজন মুসাফির এ জাতিটির এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলো। পথে রাত হয়ে গেলো। ফলে তাকে বাধ্য হয়ে তাদের সাদুম নগরীতে অবস্থান করতে হলো। তার সাথে ছিলো তার নিজের পাথেয়। কারোর কাছে সে অতিথি হবার আবেদন জানালো না। সে একটি গাছের নীচে বসে পড়লো। কিন্তু একজন সাদুমবাসী পীড়াপীড়ি করে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলো। রাতে তাকে নিজের কাছে রাখলো এবং প্রভাত হবার আগেই তার গাধাটি, তার জীন ও বাণিজ্যিক মালপত্রসহ লোপাট করে দিলো। বিদেশী লোকটি শোরগোল করলো। কিন্তু কেউ তার ফরিয়াদ শুনলো না। বরং জনবসতির লোকেরা তার অন্যান্য মালপত্রও লুট করে নিয়ে তাকে বাইরে বের করে দিলো।

একবার হযরত সারা হযরত লূতের পরিবারের খবরাখবর সংগ্রহের জন্যে নিজের গোলাম ইলিয়াযিরকে সাদুমে পাঠালেন। ইলিয়াযির নগরীতে প্রবেশ করে দেখলেন, একজন সাদুমী একজন বিদেশীকে মারছে। ইলিয়াযির সাদুমীকে বললো, তোমার লজ্জা হয় না তুমি একজন অসহায় মুসাফিরের সাথে এ ব্যবহার করছো? কিন্তু জবাবে সর্বসমক্ষে ইলিয়াযিরের মাথা ফাটিয়ে দেয়া হলো।

একবার এক গরীব লোক কোথাও থেকে তাদের শহরে এলো। কেউ তাকে খাবার দাবারের জন্যে কিছু দিলো না। সে ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে এক জায়গায় মাটিতে পড়েছিলো। এ অবস্থায় হযরত লূত (আ.)-এর মেয়ে তাকে দেখতে পেলেন। তিনি তার কাছে খাবার পৌঁছে দিলেন। এজন্যে হযরত লূত (আ.) ও তাঁর মেয়েকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হলো এবং তাদেরকে এই বলে হুমকি দেয়া হলো যে, এ ধরনের কাজ করতে থাকলে তোমরা আমাদের জনবসতিতে থাকতে পারবে না।

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা করার পর তালমূদ রচয়িতা লিখেছেন, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এ লোকেরা ছিলো বড়ই যালেম, ধোকা'বাজ এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে অসৎ। কোনো মুসাফির তাদের এলাকা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারতো না। তাদের লোকালয় থেকে কোনো গরিব ব্যক্তি এক টুকরো র‍ুটি সংগ্রহ করতে পারতো না। বহুবার এমন দেখা গেছে বাইরের কোনো লোক তাদের এলাকায় প্রবেশ করে অনাহারে মারা গেছে এবং তারা তার গায়ের পোশাক খুলে নিয়ে তার লাশকে উলংগ অবস্থায় দাফন করে

---

১৯২. আল কুর'আন, ০৭:৮১

দিয়েছে। বাইরের ব্যবসায়ীরা দূর্ভাগ্যক্রমে সেখানে পৌঁছে গেলে সর্বসমক্ষে তাদের মালামাল লুট করে নেয়া হতো এবং তাদের ফরিয়াদের জবাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো। নিজেদের উপত্যকাকে তারা একটি উদ্যান বানিয়ে রেখেছিলো। মাইলের পর মাইলব্যাপী ছিলো এ উদ্যান। তারা নিতান্ত নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে এ উদ্যানে ব্যভিচারমূলক কুকর্ম করতো। একমাত্র লূত (আ.) ছাড়া তাদের এসব কাজের প্রতিবাদ করার কেউ ছিলো না।[১৯৩]

সমকামিতা: লূত জাতির এক জঘন্যতম অপরাধ

হযরত লূত (আ.) এর কাওম একেতো কাফের ছিলো, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিলো যা পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির মধ্যে পাওয়া যায় না। আর তা হলো- সমকামিতা। অর্থাৎ পুরুষের সংগে পুরুষের ও মহিলার সংগে মহিলার যৌন সংগম বা মৈথুন। এটি ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। এটি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে এক বিরাট অপকর্ম। আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগেও এ সমকামিতা ছিলো না। লূত জাতির লোকেরা মাঠে-ঘাটে, রাস্তায়, মজলিসে বিনা দ্বিধায় পুরুষের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হতো।

এ অপরাধটির ফলে তাদের ওপর আল্লাহর যে কঠিন আযাব আপতিত হয় তা অন্য কোনো অপকর্মকারীদের ওপর অবতীর্ণ হয়নি।

‘সমকামিতা’ সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী একটি ব্যাপার। মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন ও বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যেই সকল প্রাণীর মধ্য নর-নারীর পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর মানব জাতির মধ্যে এই বিভিন্নতার আর একটি বাড়তি উদ্দেশ্য হচ্ছে, নর ও নারী মিলে এক একটি পরিবারের জন্ম দেবে এবং তার মাধ্যমে সমাজ- সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত গড়ে উঠবে। আর এ উদ্দেশ্যেই নারী ও পুরুষের দু'টি পৃথক লিংগের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতির এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করে সমমৈথুনের মাধ্যমে যৌন আনন্দ লাভ করে সে একই সংগে কয়েকটি অপরাধ করে।

প্রথমত: সে নিজের দৈহিক ও মানসিক কাঠামোর মধ্যে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করে যা দেহ, মন ও নৈতিকবৃত্তির ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
দ্বিতীয়ত: সে প্রকৃতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।
তৃতীয়ত: সে মানব সমাজের সাথে প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

---

১৯৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০৭, পৃ.-১৯-২০

কারণ সমাজ যে সমস্ড় তামাদ্দুনিক তৈরি করেছে সেগুলোকে সে ব্যবহার করে এবং তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিছু যখন তার নিজের দেবার পালা আসে তখন অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করার পরিবর্তে সে নিজের সমগ্র শক্তিকে নিরেট স্বার্থপরতার সাথে এমনভাবে ব্যবহার করে, যা সামাজিক, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার জন্যে কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় ও অলাভজনকই হয় না বরং নিদার“নভাবে ক্ষতিকরও হয়। সে নিজেকে বংশ ও পরিবারের সেবার অযোগ্য করে তোলে। অন্ড়তপক্ষে একজন পুর“ষকে নারী সুলভ আচরণে লিপ্ত করে। আর এই সংগে কমপক্ষে দু’টি মেয়ের জন্যে যৌন ভ্রষ্টতা ও নৈতিক অধঃপতনের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।[১৯৪]

বর্তমানযুগে সমকামিতার বৈধতা

ঘৃণ্য এসব কাজের জন্যে পৃথিবীর ইতিহাসে লূত জাতি চিরদিনের জন্যে কুখ্যাত হয়ে আছে এবং থাকবে। কিন্তু বর্তমানকালের অসৎ ও দুষ্কর্মশীল লোকেরা এ অপকর্ম থেকে বিরত থাকছে না। গ্রীক দার্শনিকরা এ জঘন্য অপরাধটিকে উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণের পর্যায়ে পোঁছিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ইউরোপ- আমেরিকাতে এর স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। জার্মানীর পার্লামেন্ট একে রীতিমতো বৈধ ঘোষণা করেছে।[১৯৫]

বিশ্বের যেসব দেশে সমকামিতা আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে সেই দেশগুলো হচ্ছে: আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ডস, নেদারল্যান্ডস, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন ও উর“গুয়ে। ইসরাইলসহ আরো কয়েকটি দেশে বৈধতা পেলেও তা কার্যকর করা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অংগরাজ্যে সমকামি বিয়ের অনুমতি দিয়েছে ফেডালেল কোর্ট। এ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অংগরাজ্যের মধ্যে ১৩টি অংগরাজ্যে সমকামি বিয়ে অনুমোদিত হলো। এ অংগরাজ্যগুলো হলো ক্যালিফোর্নিয়া, কানেকটিকাট, দেলাওরি, লওয়া, মাইনি, মেরিল্যান্ড, ম্যাসচুসেট্স, মাইনিসুটি, নিউ হ্যামশায়ার, নিউইয়র্ক, রডি আইল্যান্ড, ডারমন্ট, ওয়াশিংটন ডিসি ও কলম্বিয়া।[১৯৬]

বর্তমানকালে বাংলাদেশেও সমকামিতার খবর সংবাদপত্র আসছে। অযৌক্তিক এই অপরাধটি এ দেশেও ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।[১৯৭]

---

১৯৪. প্রাগুক্ত, খন্ড-০৪, পৃ.-৫৬
১৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৬
১৯৬. সমকামিতা এবং জর্ডানের মৃত সাগর, *মুহাম্মদ নুর“ল ইসলাম* (প্রবাসে বাংলাদেশ, ২৯ শে জুন, ২০১৫)
১৯৭. প্রাগুক্ত

হযরত লূত (আ.) এর দা'ওয়াত ও এর প্রতিক্রিয়া

কুর'আনের বর্ণনায় লূত জাতির প্রতি লূত (আ.) এর দাওয়াতের ভাষা ছিলো এরকম:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ • إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ • فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ • وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ •

"স্মরণ করো, তাদের ভাই লুত তাদের বলেছিল: তোমরা কি সতর্ক হবে না? আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ড় রাসূল। অতএব, তোমরা আল-াহ্‌কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (তোমাদের সতর্ক করার) এ দায়িত্ব পালনের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের।"[১৯৮]

এভাবে লূত (আ.) তাঁর জাতির লোকদেরকে এ অপকর্ম থেকে সরে এসে স্বাভাবিক অবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানালেন। কিন্তু জাতির অবাধ্য লোকেরা এতে রাগান্বিত হয়ে গেলো। তারা তাকে প্রকাশ্যে হুমকি দিলো:

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ •

"(জবাবে) তারা বলেছিল: 'হে লুত! তুমি যদি তোমার এ কাজ থেকে বিরত না হও, তাহলে অবশ্যি তোমাকে (এ দেশ থেকে) বের করে দেয়া হবে।"[১৯৯]

জাতির লোকেরা তাকে জনপদ থেকে বের করে দিতে উদ্যত হলো। সূরা আ'রাফ ও সূরা নামলে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত লূত (আ.)-কে নোটিশ দেবার আগে এ পাপাচারী জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে ফায়সালা করে নিয়েছিলো:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ •

"জবাবে তার কাওম কেবল একথাই বলেছিল: এদেরকে তোমাদের জনবসতি থেকে বের করে দাও, এরা বড় পাক পবিত্র থাকতে চায়।"[২০০]

---

১৯৮. আল কুর'আন, ২৬: ১৬১-১৬৪

১৯৯. আল কুর'আন, ২৬:১৬৭

২০০. আল কুর'আন, ০৭:৮২

ফেরেশতাদের আগমণ ও লূত (আ.) এর দুশ্চিন্ড়

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ •

"আমাদের দূতরা (ফেরেশ্‌তারা) যখন ইবরাহিমের কাছে এসেছিল সুসংবাদ নিয়ে, তখন তারা বলেছিল: 'এই জনপদবাসীকে আমরা ধ্বংস করে দেবো, এর অধিবাসিরা যালিম।"[২০১]

তারা তাঁকে হযরত ইসহাক (আ.) এবং তারপর হযরত ইয়াকুব (আ.) এর জন্মের সুসংবাদ দিলো। তারপর তারা বললো: আল-াহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে পাঠিয়েছেন লূত জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে। কারণ তার জাতি সীমালংঘন করেছিলো।

এদিকে ফেরেশতাদের আগমণে লূত (আ.) বিব্রতবোধ করলেন এবং দুশ্চিন্ড়ায় পড়ে গেলেন:

وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ •

"আমাদের দূতরা যখন লুতের কাছে এসে পৌঁছলো, তাদের দেখে সে বিষণ্ন হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো। তারা বললো: "আপনি ভয়ও পাবেন না, চিন্ড়িতও হবেন না। আমরা রক্ষা করবো আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে আপনার স্ত্রীকে বাদে। আপনার স্ত্রী পেছনে পড়াদের অন্ড়র্ভুক্ত হবে।"[২০২]

লূত (আ.) এর এই বিব্রতবোধ ও সংকুচিত হবার কারণ এই ছিলো যে, ফেরেশতারা উঠতি বয়সের সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী তর"নদের রূপ ধরে এসেছিলেন। হযরত লূত নিজের জাতির চারিত্রিক ও নৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তাদের আসা মাত্রই তাঁর অন্ড়রাত্মা কেঁপে উঠলো। তাঁর কেঁপে ওঠার কারণ হলো, যদি তাঁর কওম তাঁর মেহমানদের আগমন সংবাদ শুনতে পায় তবে দৌড়িয়ে তাঁর বাড়ীতে আসবে এবং তাঁকে বাড়ীতে রাকেন তবে তাঁরা এদের হাতে পড়ে যাবেন। তিনি তো তাঁর কওমের বদভ্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এজন্যেই তিনি অত্যন্ড় চিন্ড়িত ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন।[২০৩]

২০১. আল কুর'আন, ২৯:৩১

২০২. আল কুর'আন, ২৯:৩৩

২০৩. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-১৫, পৃ.-৫৭১

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের জনপদকে যমিন হতে উঠিয়ে আসমান পর্যন্ড় নিয়ে যান এবং সেখান হতে উল্টিয়ে ফেলে দেন। তারপর তাদের নাম অংকিত পাথর তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং যে শাস্ড়িকে তারা বহু দূরের মনে করেছিলো তা খুবই নিকটে হয়ে গেলো। তাদের বসতি স্থলে একটি তিক্ত ও দুর্গন্ধময় পানির বিল বা জলাশয় রয়ে গেলো। এটা লোকদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম হয়ে গেলো। জ্ঞানী লোকেরা তাদের দূরবস্থা ও ধ্বংসলীলার কথা স্মরণ করে যেন আল-াহর বির"দ্ধাচরণের আস্পর্ধা না দেখায়। আরববাসীদের ভ্রমণের পথে রাত-দিন এ দৃশ্য চোখের সামনে পড়তো।[২০৪]

বাইবেলে এ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

তখন তারা লূতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং দরজা ভাঙার উপক্রম করলো। কিন্তু এ লোকগুলো অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তাদের হাত বাড়িয়ে লূতকে ঘরের মধ্যে টেনে আনলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ঘরের বাইরে ছোট বড় যারাই ছিলো তাদের সবাইকে অন্ধ করে দিলেন। তারা দরজা খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ড় হয়ে পড়লো।[২০৫]

নবীর দূর্ভাগা স্ত্রী

হযরত লূত (আ.) এর জাতির খারাপ লোকদের মধ্যে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে আযাবে পতিত হতে হয়েছিল। যেহেতু আল-াহর কাছে আত্নীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের কোনো গুর"ত্ব নেই, আল-াহর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তি গুর"ত্ব পায় তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে। নবীর স্ত্রী বা স্বজন হওয়া মুক্তির মাপকাঠি নয়। তাই নবীর স্ত্রী হয়েও তার কোনো লাভ হয়নি। তার পরিণাম তার স্বামীর মতো হয়নি। সে তার জাতির ধর্ম ও চরিত্র অনুসরণ করেছিল বলে পরিণামও তার জাতির পরিণামের মতোই হয়েছিল। হযরত লূত (আ.) এর স্ত্রী ঈমান না আনার কারণে পাপাচারী জনগোষ্ঠীর দলভুক্ত বিবেচিত হয়েছিলো।[২০৬]

২০৪. প্রাগুক্ত
২০৫. *আদিপুস্ড়ক*- ১৯:৯-১১
২০৬. লূত সম্প্রদায়ের উপর আজাব এবং সমকামিতা (www.somewhereinblog.com, ১৯ মে, ২০১৩)

লূত জাতির ওপর আযাব অবতরণ

লূত জাতির অপকর্মের পরিণামে তাদের ওপর যে আযাব এসেছিল তা কুর'আনের বর্ণনায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ • مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ •

"তারপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছে, তখন আমরা সেই জনপদকে উল্টে দিয়েছি এবং তার উপর অনবরত বর্ষণ করেছি পাথর কঙ্কর। তোমার রবের পক্ষ থেকে সেগুলো ছিলো (তাদের) নাম লেখা কঙ্কর। সেই জনপদ (তোমার প্রতিপক্ষ) এই যালিমদের থেকে দূরে নয়।"[২০৭]

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ •

"আমরা তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম এক চূড়ান্ড় বর্ষণ! যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্যে এ বর্ষণ ছিলো কতো যে নিকৃষ্ট!"[২০৮]

লূত (আ.) আল-াহর নির্দেশে রাতের শেষ প্রহরে ঐ জনপদ ছেড়ে বিশ্বাসী লোকদের নিয়ে যখন রওনা হয়ে গেছেন তখনই ভোরের আলো ফুটতেই সহসা একটি প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটলো। একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প তাদের জনবসতিকে ওলট-পালট করে দিয়েছিলো। একটি ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে ব্যাপক হারে পাথর বৃষ্টি হয়েছিলো। এমনকি একটি ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমেও তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করা হলো। আজ পর্যন্ড় লূত সাগরের (Dead Sea) দক্ষিণ ও পূর্ব এলাকায় এ পাথর বর্ষণের চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

সকালেই সমগ্র দেশ ধ্বংস হয়ে ভূপৃষ্ঠ হতে পাপিষ্ঠদের চিহ্ন চিরতরে মুছে গেলো। সবকিছু ধ্বংস হয়ে সম্পূর্ণ এলাকা সাগরে পরিণত হলো, যা আজও জর্ডানের মানচিত্রে বিদ্যমান আছে।

মৃত সাগরে লূত জাতির আযাবের নিদর্শন

বাইবেলের বর্ণনাগুলো, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী, আধুনিক ভূমিস্ড়র গবেষণা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ থেকে আযাবের যে বর্ণনা জানা যায় তা হলোঃ লূত সাগরের (Dead Sea) পূর্ব ও দক্ষিণের যে অঞ্চলটি বর্তমানে জনমানবহীন বিরাণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, সেখানে বিপুল সংখ্যক পুরনো জনপদের ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো প্রমাণ করে যে, এটি এক সময়

২০৭. আল কুর'আন, ১১:৮২-৮৩
২০৮. আল কুর'আন, ২৬:১৭৩

ছিলো অত্যন্ড় জনবহুল এলাকা। আজও সেখানে শত শত ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের চিহ্ন পাওয়া যায়।

প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ সাল পর্যন্ড় এটি ছিলো বিপুল জনবসতি ও প্রাচুর্যপূর্ণ এলাকা। আর হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর আমল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনুমাণ সেটি ছিলো খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার সালের কাছাকাছি সময়। এদিক দিয়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ্য এ কথা সমর্থন করে যে, এ এলাকাটি হযরত ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর ভাতিজা লূত -এর সময়ে ধ্বংস হয়েছিলো।

বাইবেলে যে এলাকাটিকে বলা হয়েছে 'সিদ্দিমের উপত্যাকা' সেটিই ছিলো এখানকার সবচেয়ে জনবহুল ও শস্য শ্যামল এলাকা। এ এলাকাটি সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে: 'জর্দানের সমস্ড় অঞ্চল সোয়র পর্যন্ড় সর্বত্র সজ্‌ল, সদারবর উদ্যানের ন্যায়, মিসর দেশের ন্যায়, কেননা তৎকালে সদারব সদোম ও ঘমোরা বিনষ্ট করেন নাই।"[২০৯]

বর্তমানকালের গবেষকদের অধিকাংশের মত হচ্ছে যে উপত্যাকাটি বর্তমানে মর" সাগরের বুকে জলমগ্ন আছে। বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এ মত গঠন করা হয়েছে। প্রাচীনকালে মর"সাগর দক্ষিণ দিকে বর্তমানের মতো এতোটা বিস্তৃত ছিলো না। ট্রান্স জর্দানের বর্তমান শহর 'আল কারক'- এর সামনে পশ্চিম দিকে এ হ্রদের মধ্যে 'আল লিসান' নামক একটি ব-দ্বীপ দেখা যায়। প্রাচীনকালে এখানেই ছিলো পানির শেষ প্রান্ড়। এর নিম্নাঞ্চলে বর্তমানে পানি ছড়িয়ে গেছে। পূর্বে এটি উর্বর শস্য শ্যামল জনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিলো। এটিই ছিলো সিদ্দিম উপত্যাকা এবং এখানেই ছিলো লূতের জাতির সদোম, ঘমোরা, অদোমা, সবোয়ীম ও সুগার -এর মতো বড় বড় শহরগুলো। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার সালের কাছাকাছি একসময় একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে এ উপত্যাকাটি ফেটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায় এবং মর" সাগরের পানি একে নিমজ্জিত করে ফেলে। আজও এটি হ্রদের সবচেয়ে অগভীর অংশ। কিন্তু বাইজানটাইন শাসকদের যুগে এ অংশটি এতো বেশি অগভীর ছিলো যে, লোকেরা আল লিসান থেকে পশ্চিম তীর পর্যন্ড় পায়ে হেঁটে পানি পার হতো। তখনও দক্ষিণ তীরের লাগোয়া এলাকায় পানির মধ্যে ডুবন্ড় বনাঞ্চল পরিষ্কার দেখা যেতো। পানির মধ্যে কিছু দালান কোঠা ডুবে আছে বলেও সন্দেহ করা হতো।[২১০]

---

২০৯. আদিপুস্ড়ক ১৩:১০

২১০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-১০, পৃ.-১২২

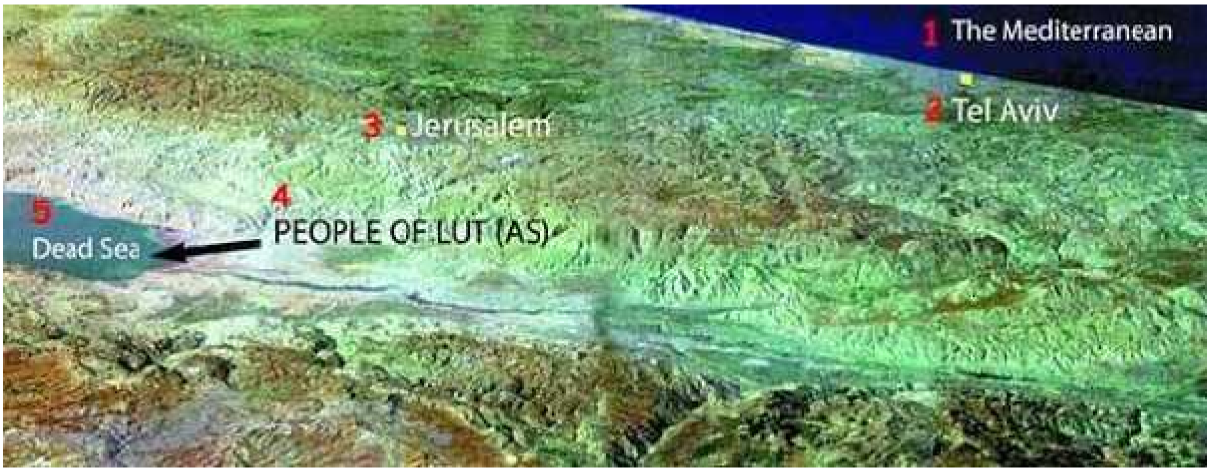
1 The Mediterranean
2 Tel Aviv
3 Jerusalem
4
PEOPLE OF LUT (AS)
5
Dead Sea

মৃত সাগর

মৃত সাগর

বাইবেলে ও পুরাতন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী থেকে জানা যায়, এ এলাকার বিভিন্ন স্থানে নাফাত (পেট্রোল) ও স্ফল্টের কূয়া ছিলো। অনেক জায়গায় ভূগর্ভ থেকে অগ্নিউদ্দীপক গ্যাসও বের হতো। এখানে সেখানে ভূগর্ভে পেট্রোল ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ভূ-স্ড়র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করা হয়েছে, ভূমিকম্পের প্রচন্ড ঝাঁকুনির সাথে পেট্রোল, গ্যাস ও স্ফল্ট ভূ-গর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে এবং সমগ্র এলাকা ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাইবেলের বর্ণনা মতে, এ ধ্বংসের খবর পেয়ে হযরত ইবরাহিম (আ.) হিব্রোন থেকে এ উপত্যাকার অবস্থা দেখতে আসেন। তখন মাটির মধ্য থেকে কামারের ভাঁটির ধোঁয়ার মতো ধোঁয়া উঠছিলো।[২১১]

মৃত সাগর ও আমাদের শিক্ষা

وَلَقَد تَّرَكۡنَا مِنۡهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوۡمٍ يَعۡقِلُونَ •

"যারা বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে চলে আমরা এ ঘটনার মধ্যে তাদের জন্যে রেখে দিয়েছি একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।"[২১২]

এ সুস্পষ্ট নিদর্শনটি হচ্ছে মর‍সাগর। কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এ যালেম জাতিটির কৃতকর্মের পরিণামে তাদের ওপর যে আযাব এসছিলো তার চিহ্ন এখনো বর্তমান রয়েছে। পরবর্তী লোকদের জন্যে আল্লাহ এ নিদর্শনটি প্রকাশ্য রাজপথে রেখে দিয়েছেন।

বর্তমানকালে এ কথা প্রায় নিশ্চয়তার সাথে স্বীকার করা হচ্ছে যে মর‍সাগরের দক্ষিণাংশ এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে তলিয়ে গিয়েছে। (আর তলিয়ে যাওয়া এ অংশটির উপরিভাগে মর‍সাগরের পানি ছেয়ে গিয়েছে।) এখানেই লূত জাতির কেন্দ্রীয় শহর 'সাদুম' অবস্থিত ছিলো। এ অংশে পানির নিচে কিছু নিমজ্জিত জনপদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পানির নিচের ধ্বংসাবশেষ খোঁজার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সূরা আয যারিয়াতেও আল-াহ বলেছেন:

وَتَرَكۡنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الۡعَذَابَ الۡأَلِيمَ •

"যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে, তাদের জন্যে আমরা সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি।"[২১৩]

---

২১১. আদিপুস্ড়ক ১৯:২৮

২১২. আল কুর'আন, ২৯:৩৫

২১৩. আল কুর'আন, ৫১:৩৭

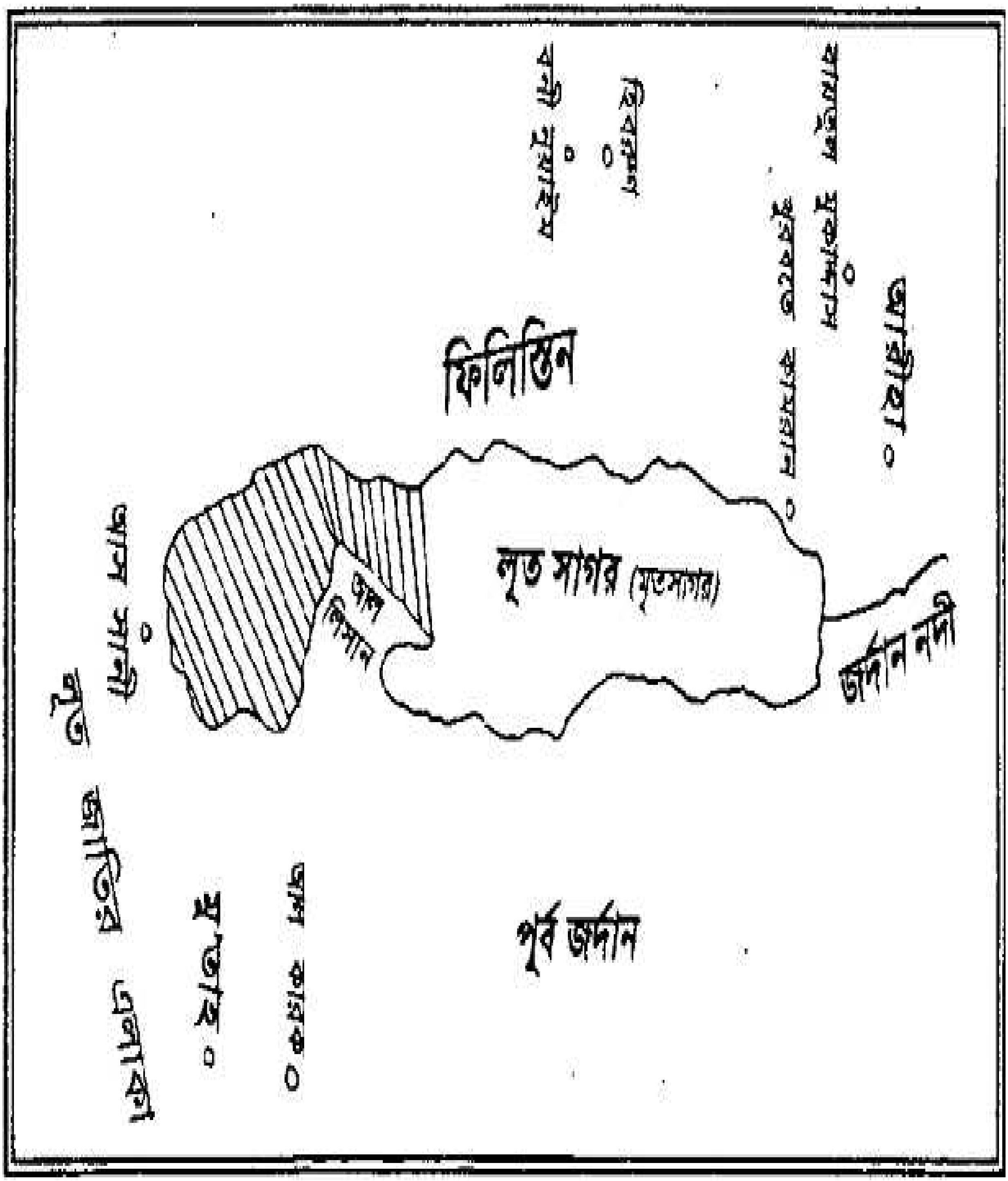

লূত জাতির বাসস্থান

মর৺ সাগরের দক্ষিণাঞ্চল যে সাংঘাতিক ধ্বংসের নিদর্শন পেশ করছে তাতে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে একটি শিক্ষা। যেন তারা বুঝতে পারে, আল-াহর আনুগত্য অস্বীকার কারীদের কি ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে!

আল-াহর আযাবের এক সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক সাক্ষী মর৺সাগর। ১৯৬৫ সালে একদল আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানী 'আল লিসানে' এক বিশাল কবরস্থান আবিষ্কার করেছে যেখানে ২০ হাজারের অধিক কবর আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে বুঝা যায়, এটি যে শহরের কবরস্থান তা সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে।

আসমান ও যমিনের স্রষ্টা মহান আল-াহ তা'য়ালা এভাবেই বিভিন্ন নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন তাঁর কঠোর আযাবের ব্যাপারে। এ থেকে বুদ্ধিমান মানুষেরা অবশ্যই খুঁজে পাবে সঠিক ও সুন্দর পথকে।

৫ম পরিচ্ছেদ

অভিশপ্ত ফেরাউনের লাশঃ ইতিহাসের এক জ্বলন্ড় নিদর্শন

ফেরাউনের পরিচয়

হযরত ইয়াকুবের বংশধররা হযরত ইউসুফের মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন মিশরের বিভিন্ন সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকে। হযরত ইউসুফের জন্ম ধরা হয় খৃষ্টপূর্ব ১৯০৬ সালে। তারপর তিনি বড় হন এবং মিশরের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময় মিশর শাসন করতো ‘রাখাল রাজারা’। এরা ছিলো বিদেশী। এরা প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দী পর্যন্ড় মিশরে রাজত্ব করে। এদের রাজত্বকালের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ড় বনি ইসরাঈলের লোকেরা সরকার পরিচালনায় প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। হযরত ইয়াকুবের বংশধরদের বনি ইসরাঈল বলা হয়।

খৃষ্টপূর্ব পনেরো শতাব্দীর শেষের দিকে মিশরের কিবতি বংশীয়রা জাতীয়তাবাদী বিপ- ব ঘটিয়ে রাজত্ব দখল করে এবং রাখাল রাজাদের মিশর থেকে বিতাড়িত করে। ফলে বনি ইসরাঈলও ক্ষমতাচ্যুত হয়। শুধু ক্ষমতাচ্যুতই নয়, শুর“ হয় তাদের ওপর চরম অত্যাচার আর নির্যাতন। কিবতিরা ক্ষমতা দখল করে তাদের রাজার উপাধি দেয় ‘ফেরাউন’। ‘ফেরাউন’ মানে সূর্য, দেবতার প্রতিনিধি।[২১৪]

সমগ্র বিশ্বে ভয়াবহ এই ঐতিহাসিক ঘটনা সকলেই জানে যে, ফেরাউন ও তার বাহিনী আল- াহর আযাবের শিকার হয়ে সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত হয়। রাসূল (সা.)-এর সময়ে আরবে বহুসংখ্যক ইহুদি ও নাসারা বসবাস করতো যাদের মাধ্যমে সকল আরববাসীই জানতো যে, হযরত মূসা (আ.) কে নবী হিসেবে তাদের নিকট পাঠানো হয়েছিলো। তারা এটাও জানতো যে, মুসা (আ.) বিস্ময়কর মু‘জিযা প্রদর্শন করে তাদেরকে সত্যের দা‘ওয়াত দেন। কিন্তু তারা কোনো মু‘জিযা দেখার পরও ঈমান আনেনি। কুরাইশের লোকেরাও হযরত মূসা (আ.) এর এসব মু‘জিযার ব্যাপারে অবহিত ছিলো। বস্তুতঃ মুহাম্মদ (সা.) -এর বির“দ্ধে তাদের একটি অভিযোগ এটাও ছিলোঃ

قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ •

“তারা বললোঃ এই নবীকে সেই মু‘জিযা কেন দেয়া হয়নি যা মূসা (আ.) কে দেয়া হয়েছিলো?”[২১৫]

---

২১৪. আবদুস শহীদ নাসিম, *নবীদের সংগ্রামী জীবন* (ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, প্রকাশকাল- জুন ২০০৭), পৃ.-২২
২১৫. আল কুর’আন, ২৮:৪৮

ফেরাউন নামটি কুর'আনের ২৭টি সূরায় ৭৪ বার উলে-খ করা হয়েছে। কিন্তু কুর'আনে মূসা (আ.) -এর সময়কার মিশররাজ ফেরাউনের প্রকৃত নাম উলে-খ করা হয়নি। কুর'আন থেকে জানা যায়, মূসা (আ.) কে রাসূল হিসেবে অবিশ্বাসী ফেরাউনের একজন উপদেষ্টা ছিলেন হামান। কুর'আনে এই হামানের নাম ৬ বার উলে-খ করা হয়েছে।

ফেরাউনের অপরাধসমূহ

ফেরাউনের অপরাধসমূহ আল কুর'আনে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছেঃ

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ •

"ফেরাউন দেশে হঠকারী নীতি অবলম্বন করে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে একদল লোককে দুর্বল করে রেখেছিল। তাদের পুত্রদের যবাই করছিল এবং মেয়েদের জীবিত রাখছিলো। সে ছিলো একজন ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টিকারী।"[২১৬]

ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করেছিলো। অহংকারী ও স্বৈরাচারী হয়ে সে তার অধীনস্থদের ওপর যুল্ম করেছিলো। তার রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকারও দেয়া হয়নি। বরং সে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীন করে পদানত, পর্যুদস্ড়, নিস্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়।

ফেরাউন ছিলো আল-াহদ্রোহী সীমালংঘনকারী ও অত্যাচারী। কুর'আনের আয়াতে ফেরাউন ও তার সভাসদদের নির্বুদ্ধিতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ফেরাউন নিজেকে খোআ বলে দাবী করতো। আর তার পরিষদবর্গও নির্বিবাদে তা মেনে নিতো। নিঃসন্দেহে এটা ছিলো ঘৃণ্য অংশীবাদিতা ও মিথ্যাচার। অপরদিকে হযরত মুসা (আ.) ছিলেন সত্য পয়গম্বর। আল-াহ কর্তৃক প্রদত্ত অনেক নিদর্শনাবলী দ্বারা শোভিত ও সাহায্য মন্ডিত। তাঁর সকল কর্মকান্ডই ছিলো মানব কল্যাণে নিবেদিত। অথচ তাঁর শুভ-আহ্বানকে বার বার প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা। তাই অত্যন্ড় মন্দ পরিণতি ছিলো তাদের জন্যে অবধারিত।[২১৭]

২১৬. আল কুর'আন, ২৮:০৪

২১৭. কাযী ছানাউল-াহ পানিপথী (রহঃ), প্রাগুক্ত, খন্ড-০৬, পৃ.-১০৭

মিসরীয় জাতির সাথে ফেরাউনের যে আচরণ ছিলো তার পুরো চিত্র সূরা যুখরুফের মাত্র একটি আয়াতে ফুটে উঠেছে।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ •

"সে তার জাতিকে হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো ফাসেক।"[২১৮]

এই ছোট্ট আয়াতটিতে একটি অনেক বড় সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরাউন তার দেশে স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর জন্যে সব রকমের প্রতারণা, শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়েছিলো। সে তার বিবেক-বুদ্ধিহীন ও নৈতিকতা বিবর্জিত জাতিকে তার অনুগত দাসে পরিণত করে এবং তার জাতিও তা মেনে নেয়। এটা মেনে নেয়া দ্বারা তারা প্রমাণ করে দেয় যে, সেই ঘৃণ্য লোকটি তাদেরকে যা মনে করেছিলো তারা বাস্তবেও তাই। তাদের এ লাঞ্ছনাকর অবস্থায় পতিত হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে, তারা মৌলিকভাবে 'ফাসেক'। 'হক ও বাতিল' এবং 'ইনসাফ ও যুল্‌ম' এসব বিষয়ের পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থই ছিলো তাদের কাছে আসল গুরুত্বের বিষয়।

ফেরাউনের প্রতি মূসা (আ.) -এর দা'ওয়াত ও ফেরাউনের ধূর্তামী

হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'য়ালা নয়টি নিদর্শন বা মু'জিযা দিয়ে রাসূল হিসেবে নিয়োগ করেন।

মূসা (আ.) ফেরাউন ও তাঁর অন্যান্য খোদাদ্রোহী নেতাদের সামনে এ মোযেজাগুলো প্রদর্শন করেন এবং তাদের এক আল্লাহর দাসত্ব মানার ও বনি ইসরাঈলদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার আহ্বান জানান। সে সময় গোটা মিশর সম্রাজ্যের একটি লোকও ফেরাউনের সামনে কথা বলার সাহস রাখতো না। তার ত্রাসে সব মানুষ ছিলো আতংকিত। মানুষের জীবনের কোনো মর্যাদা তার কাছে ছিলো না। সেই দূর্ধর্ষ ফেরাউনের দরবারে মূসা (আ.) উপস্থিত হলেন এবং তাকে সত্য পথের দা'ওয়াত দিলেন। মূসা (আ.) তাকে যুক্তির মাধ্যমে এক আল্লাহর দাসত্ব করার আহ্বান জানালেন। ফেরাউন বার বার মূসার শানিত যুক্তির সামনে হেরে গিয়েছিলো। তবুও সে মূসার কথা মেনে নেয়নি। মূসা (আ.) তার সামনে আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযা দেখালেন। মূসা (আ.) একটি লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে সেটা বিরাট অজগরে পরিণত হলো। তারপর সেটাকে ধরে ফেললেন এবং তা পুনরায় লাঠি হয়ে গেলো। মুসা (আ.) বগলের ভেতর থেকে হাত টেনে বের করলেন, সাথে সাথে তা সবার সামনে চকচক করে উঠলো।

২১৮. আল কুর'আন, ৪৩:৫৪

এসব অলৌকিক ঘটনা দেখে ফেরাউন হতভম্ব হয়ে গেলো। তবুও সে মূসার দাবি মেনে নিলো না। সে মূসাকে একজন যাদুকর হিসেবে অভিহিত করলো এবং মিশরের সব দক্ষ যাদুকরদের একত্র করে মূসার সাথে যাদুর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলো।

মূসার কাছে ছিলো মু'জিযা যা তাকে দেয়া আল-াহর অকাট্য সত্য নিদর্শন। আর যাদুকরদের কাছে ছিলো মিথ্যা ও ধোঁকার যাদু।

মিশরের সব পাকা যাদুকররা তাদের যাদু প্রদর্শনের পর মূসা যাদুকরদের বললেন:

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّـهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ • وَيُحِقُّ اللَّـهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ •

"তারা যখন নিক্ষেপ করলো, মূসা বললো: তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা তো ম্যাজিক! আল-াহ্ অবশ্যি এ জিনিসকে বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল-াহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সংশোধন করেন না। আল-াহ্ তাঁর বাণীর সাহায্যে সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না।"[২১৯]

এ কথাগুলো বলে মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করার সাথে সাথে লাঠিটি এক বিরাট আজদাহা অজগর হয়ে হা করে উঠলো এবং চোখের নিমিষে সে খেয়ে ফেললো যাদুকরদের প্রদর্শিত সব যাদু। এমনকি সে যাদুকরদের যাদু দেখাবার সব ক্ষমতাও খেয়ে ফেললো। সাথে সাথে যাদুকররা মূসা যে সত্যি আল-াহর নবী এ মহা সত্য উপলব্ধি করে আল-াহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। ফেরাউন ও উপস্থিত জনতার সামনে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিলো:

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ • قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ • رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ •

"তখন ম্যাজেসিয়ানরা সাজদায় আনত হয়ে পড়লো। তারা বললো: 'আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামিনের প্রতি, যিনি হারূণ এবং মূসারও রব।"[২২০]

যাদুকরদের পরাজয়ের ফলে ফেরাউনেরও চরম পরাজয় হলো। মূসা (আ.) যে সর্বশক্তিমান আল-াহর রাসূল সে কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো। আর এরপরই শুরু হয়ে গেলো ঈমানদারদের ওপর ফেরাউনের চরম অত্যাচার-নির্যাতন। নির্যাতনে নিষ্পিষ্ঠ মূসা (আ.) -এর অনুসারীরা এতে বিচলিত হননি। তারা বললেন:

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ • فَقَالُوا عَلَى اللَّـهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

২১৯. আল কুর'আন, ১০:৮১-৮২
২২০. আল কুর'আন, ২৬:৪৬-৪৮

فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ • وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ •

"মূসা বলেছিল: 'হে আমার কাওম! তোমরা যদি আল-াহ্‌র প্রতি ঈমান এনে থাকো তাহলে তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো। তারা বলেছিল: আমরা আল-াহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল করলাম, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ যালিম লোকদের নির্যাতনের পাত্র বানিয়ো না। আর তোমার দয়ায় আমাদেরকে এ কাফির কাওমের কবল থেকে নাযাত দাও।"[২২১]

দূর্ধর্ষ ফেরাউনের ভয়াবহ পরিণাম

এক পর্যায়ে ফেরাউন মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না। এমনকি সে মূসা (আ.)-কে হত্যার ঘোষণা পর্যন্ড় দিলো। এই চরম সংকটপূর্ণ সময়ে মহান আল-াহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ঘোষণা আসলো:

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ •

"মূসা! এখন আমার বান্দাদের নিয়ে মিশর থেকে রাতারাতি বের হয়ে পড়ো। আর মনে রেখো, ওরা তোমাদের পিছু ধাওয়া করবে।"[২২২]

আল-াহর নির্দেশে মূসা (আ.) তাঁর ২০ লক্ষ সাথি নিয়ে এগিয়ে চললেন ফিলিস্ড়িনের সিনাই ভূ-খন্ড অভিমুখে। সামনেই ছিলো লোহিত সাগর। ফেরাউনও তার দলবল নিয়ে মুসলিমদের আক্রমণ করার জন্যে তাদের পিছু নিলো। লোহিত সাগরের তীরে আসার পর মূসা (আ.)-কে আল-াহ নির্দেশ দিলেন:

أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ •

"তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো।"[২২৩]

আল-াহর নির্দেশে মূসা (আ.) লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করার সাথে সাথে সমুদ্রটি একটি শুকনো রাস্ড়া হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মু'জিযার রাস্ড়া দিয়ে আল-াহর অনুসারীরা পার হয়ে গেলেন লোহিত সাগর।

পেছন থেকে ফেরাউন বাহিনীও সেই রাস্ড়ার ওপর দিয়ে আসতে লাগলে রাস্ড়াটি আবার সমুদ্র হয়ে গেলো। হাবু-ডুবু খেতে লাগলো ফেরাউন বাহিনী। ফেরাউন নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নিজেকে ঈমানদার হিসেবে ঘোষণা করলো।

কিন্তু উত্তর আসলো:

---

২২১. আল কুর'আন, ১০:৮৪-৮৬

২২২. আল কুর'আন, ৪৪:২৩; ২৬:৫২; ২০:৭৭

২২৩. আল কুর'আন, ২৬:৬২

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ • آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ •

"আমরা বনি ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিয়েছিলাম আর ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্যের সাথে সীমালংঘন করে তাদের পিছু ধাওয়া করে। তারপর যখন সে পানিতে ডুবতে থাকলো, বললো: 'আমি (একথার প্রতি) ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনি ইসরাঈল এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।' এখন! অথচ ইতোপূর্বে তুমি অমান্য করেছিলে এবং তুমি ছিলে একজন ফাসাদ সৃষ্টিকারী।"[২২৪]

শেষ হয়ে গেলো ফেরাউন ও তার বাহিনী। লাখো লাখো বনি ইসরাঈল দেখলো তাগুত ফেরাউন ও তার সংগিদের ডুবে মরার ভয়াবহ দৃশ্য। এভাবেই আল্লাহ সত্য মিথ্যার সংঘাতে সত্যকে বিজয়ী করেন আর মিথ্যাকে করেন ধ্বংস। ফেরাউন ও তার অনুসারীদের এই করুণ পরিণতিতে ব্যথিত হয়নি কেউই। মহান আল্লাহ বলেন:

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ • وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ • وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ • كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ • فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ •

"কতো যে বাগবাগিচা আর ঝরণাধারা পেছনে রেখে এসেছিল তারা! রেখে এসেছিল শস্য ক্ষেত, বিলাসবহুল প্রাসাদ, আর কতো যে বিলাস সামগ্রী, যেগুলোতে তারা ছিলো উল্লাসে মত্ত। এমনটিই ঘটেছিল, আর আমরা এসব কিছুর ওয়ারিশ বানিয়েছিলাম অপর একদল লোককে। আসমান কিংবা যমিন কেউই তাদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি এবং তাদের কোনো প্রকার অবকাশও দেয়া হয়নি।"[২২৫]

২২৪. আল কুর'আন, ১০:৯০-৯১
২২৫. আল কুর'আন, ৪৪:২৫-২৯

ফেরাউনের লাশ

ফেরাউনের রক্ষিত লাশ: আল কুর'আনের অলৌকিক নিদর্শন

আল্লাহর নবী মুসা (আ.) ঐ পাপিষ্ঠ ফেরাউনকে অনেকবার ইসলামের দা'ওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও নিকৃষ্টতম নাফরমান ফেরাউন মুসা (আ.) -এর আহ্বানে সাড়া তো দেয়ইনি বরং অত্যাচার আর যুল্‌মের সীমা অতিক্রম করেছিলো। অতঃপর ফেরাউনের যুলুমের আয়ু যখন শেষ হয়ে আসে। মহান আল-াহ ঐ নাফরমানকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং মানবজাতির নিদর্শনের জন্যে তার মৃত দেহ সংরক্ষণ করেছেন।

ফেরাউন সমুদ্রে ডুবে মরার সময় ঈমান আনতে চেয়েছিলো। তখন আল-াহর পক্ষ থেকে জবাব ছিলো:

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ • آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ • فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ •

"আমরা বনি ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিয়েছিলাম আর ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্যের সাথে সীমালংঘন করে তাদের পিছু ধাওয়া করে। তারপর যখন সে পানিতে ডুবতে থাকলো, বললো: 'আমি (একথার প্রতি) ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনি ইসরাঈল এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলাম। এখন! অথচ ইতোপূর্বে তুমি অমান্য করেছিলে এবং তুমি ছিলে একজন ফাসাদ সৃষ্টিকারী। আজ আমরা তোমার দেহটা রক্ষা করবো, যাতে করে তুমি পরবর্তীদের জন্যে নিদর্শন হয়ে থাকো। অনেক মানুষই আমাদের নিদর্শন সম্পর্কে গাফিল।"[২২৬]

২২৬. আল কুর'আন, ১০:৯১-৯২

মিশরের যাদুঘরে রক্ষিত ফেরাউনের মমি

মহান আল-াহ ফেরাউনের এ ভীতিকর অবস্থার সংবাদ জানিয়ে বলেছেন:

هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ •

"এটি (এ কুরআন) মানুষের জন্যে একটি বার্তা, যাতে করে এর মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা যায় এবং মানুষ জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই তিনি একমাত্র ইলাহ্, আর যেনো বুঝ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।"[২২৭]

হ্যাঁ, আল-াহ তা'য়ালা ফেরাউনের লাশটিকে রক্ষা করেছেন তাদের জন্যে যারা পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। আনুমানিক ৩৫০০ বছর ডুবে থাকার পর আল-াহদ্রোহী ফেরাউনের লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় ১৮৯৮ সালে। এতো বছর পানির নিচে থাকা সত্ত্বেও তার লাশে কোনো পচন ধরেনি।[২২৮]

সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম সাগর তীরে যেখানে ফেরাউনের লাশ সাগরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো আজো সে জায়গাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমান সময়ে এ জায়াগটির নাম 'জাবালে ফেরাউন বা ফেরাউন পর্বত। এরি কাছাকাছি আছে একটি গরম পানির ঝরণা। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে হাম্মামে ফেরাউন। এর অবস্থান স্থল হচ্ছে আবু যানিমার কয়েক মাইল ওপরে উত্তরের দিকে। স্থানীয় লোকেরা এ জায়গাটি চিহ্নিত করে বলেন, ফেরাউনের লাশ এখানে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো।[২২৯]

ফেরাউনের লাশটি এখনো কায়রোর তাহরীর জাদুঘরে "দ্যা রয়েল মমি" হলে একটি কাঁচের সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। তার লাশের উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ২০২ সেন্টিমিটার।[২৩০]

১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটিন এলিট স্মিথ তার মমির ওপর থেকে যখন পট্টি খুলছিলেন। তখন তার লাশের ওপর লবণের একটি স্ড়র জমাট বাধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। এটি লবণাক্ত পানিতে তার ডুবে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট আলামত।[২৩১]

মহান আল-াহ পরবর্তীদের জন্যে এ লাশটিকে একটি উপদেশমূলক ও শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে রক্ষা করেছেন।

---

২২৭. আল কুর'আন, ১৪:৫২

২২৮. ইসলামিক ওয়েবসাইট (www.beshto.com)

২২৯. মাওলানা কাসেম শরীফ, *গোটা বিশ্বের জন্যে দৃষ্টান্ড় ফেরাউনের মৃত্যু*, (www.beshto.com ২৬ মে ২০১৬)

২৩০. প্রাগুক্ত

২৩১. প্রাগুক্ত

• فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ • فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ •

“তারা যখন আমাদের ক্রোধান্বিত করলো, আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং ডুবিয়ে মারলাম তাদের সবাইকে। তারপর পরবর্তীদের জন্যে আমরা তাদের করে রাখলাম অতীত (ইতিহাস) আর উদাহরণ।”[২৩২]

ফেরাউনের লাশ পাওয়ার প্রায় ১৪০০ বছর আগেই কুর'আনে এর কথা বলা হয়েছে। নির্মোহ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের বাণী শুধু সঠিকই নয়, বরং এক ব্যাখ্যাতীত নির্ভুল সঠিকতত্ত্বে তা বিশ্বাসীদের মনকে দ্রবিভূত করে।

পবিত্র কুর'আনে ফেরাউনের আলোচনা যতো এসেছে পূর্ব যুগের অন্য কোনো নরপতি সম্পর্কে এতো বেশি আসেনি। এর মাধ্যমে ফেরাউনী যুল্মের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাতে ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, যুগে যুগে ফেরাউনরা আসবে এবং ঈমানদার সৎকর্মশীলদের ওপরে তাদের যুল্মের ধারা ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম হবে। কোনো যুগই ফেরাউন থেকে খালি থাকবে না। পবিত্র কুর'আনে ফেরাউনকে নিয়ে এতো আলোচনার কারণ হলো, যাতে আল-াহর প্রিয় বান্দারা সাবধান হয় এবং যালেমদের ভয়ে আল-াহর পথ থেকে বিচ্যুত না হয়।[২৩৩]

ফেরাউনের মরদেহের সংরক্ষণ অত্যন্ড় গুর ত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি এমন একজন মানুষের মরদেহ হযরত মুসা (আ.) এর সাথে যার পরিচয় হয়েছিলো, সে মানুষটি মুসা (আ.) এর ধর্মীয় প্রচার প্রতিহত করতে চেয়েছিলো এবং মুসা (আ.) যখন তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মিসর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেই লোকটিই তাদের পেছনে ধাওয়া করেছিলো। আর ধাওয়া করতে গিয়েই মারা পড়েছিলো সমুদ্রের পানিতে ডুবে। আল-াহর ইচ্ছাতেই তার মরদেহ ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। এবং কুরআনের বাণী অনুসারেই ভবিষ্যত মানবজাতির জন্যে তা নিদর্শন হিসেবে রয়ে গিয়েছে সংরক্ষিত।[২৩৪]

---

২৩২. আল কুর'আন, ৪৩: ৫৫-৫৬

২৩৩. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল-াহ আল গালিব, *নবীদের কাহিনী* (www.at-tahreek.com)

২৩৪. মোঃ ইমতিয়াজ আল-হার ন, *ফেরাউনের সংরক্ষিত লাশ: মানবজাতির সামনে বড় এক নিদর্শন*, (www.somewhereinblog.net, ১লা মার্চ, ২০১১)

ফেরাউনের লাশটি একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ তাদের জন্যে যারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। এ লাশটির মাধ্যমে বুদ্ধিমানরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে, ফেরাউনের মতো আচরণকারীদের কি ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে!

তাই ফেরাউনের উত্তরসূরী যারা বর্তমানে তাদের ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণ করে আল-াহ যেভাবে মানব জাতির জন্যে নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছেন ঠিক তেমনি হয়তো যালিমদের কৃতকর্ম ও পরিণতিকে সংরক্ষণ করে তা বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের জন্যে নিদর্শন হিসেবে রাখার বন্দোবস্ড় করবেন।[২৩৫]

২৩৫. পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম যালিম- মিশরের ফেরাউন ও তার পরিণতি (banglanews247365.blogspot.com ২২ মে, ২০১৩)

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহান আল-াহর নিয়ামত অস্বীকারকারী কাওমে তুব্বার পরিণতি

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ •

"আইকা'বাসী আর তুব্বা সম্প্রদায়ও। এরা প্রত্যেকেই রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে তাদের উপর অনিবার্য হয়ে পড়েছিল আমার ওয়াদা বাস্‌ড়বায়ন।"[২৩৬]

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ •

"এরাই কি শ্রেষ্ঠ, নাকি তুব্বা জাতি এবং তাদের আগেকার লোকেরা? আমরা তাদের হালাক (ধ্বংস) করে দিয়েছিলাম, কারণ তারা ছিলো অপরাধী।"[২৩৭]

মহান আল-াহর ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের উদাহরণ হিসেবে পবিত্র কুর'আনে দু'বার কাওমে তুব্বার কথা উলে-খ করেছেন। ইয়েমেনের হিময়ার গোত্রের বাদশাহদের উপাধি ছিলো 'তুব্বা'। যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের উপাধি ছিলো কিসরা, কায়সার, ফেরাউন প্রভৃতি। তুব্বা জাতি সাবা জাতির একটি শাখার সাথে সম্পর্কিত ছিলো।

সাবা জাতির পরিচয়ঃ

ইতিহাসের দৃষ্টিতে সাবা দক্ষিণ আরবের একটি বৃহৎ জাতির নাম। কতগুলো বড় বড় গোত্র সমন্বয়ে এ জাতিটি গড়ে উঠেছিলো। অতি প্রাচীনকাল থেকে আরবে এ জাতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে উর -এর শিলালিপিতে সাবোম নামের মধ্য দিয়ে এর উলে-খ পাওয়া যায়। এরপর ব্যবিলন ও আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং অনুরূপভাবে বাইবেলেও ব্যাপকহারে এর উলে-খ দেখা যায়। গ্রীক ও রোমীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ এবং ভূগোলবিদগণ থিয়োফ্রষ্টিসের (খৃষ্টপূর্ব ২৮৮) সময় থেকে খৃষ্ট পরবর্তী কয়েকশো বছর পর্যন্‌ড় অবিচ্ছিন্নভাবে এর আলোচনা করে এসেছেন।

এ জাতির আবাসভূমি ছিলো আরবের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্তমানে ইয়েমেন নামে পরিচিত এলাকাটি। এর উত্থানকাল শুর— হয় খৃষ্টপূর্ব এগারোশো বছর থেকে। হযরত

২৩৬. আল কুর'আন, ৫০:১৪
২৩৭. আল কুর'আন, ৪৪:৩৭

দাউদ ও হযরত সুলাইমান (আ.) এর যুগে একটি ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি হিসেবে সারা দুনিয়ায় এর নাম ছড়িয়ে পড়ে। শুর“তে এটি ছিলো একটি সূর্যোপাসক জাতি। তারপর এর রাণী যখন হযরত সুলাইমানের (৯৬৫-৯২৬ খৃষ্টপূর্ব) হাতে ঈমান আনেন তখন জাতির বেশির ভাগ লোক মুসলিম হয়ে যায়। কিন্তু পরে কোনো এক সময় থেকে আবার তাদের মধ্যে শির্‌ক ও মূর্তিপূজা প্রবল হয় এবং তারা আলমাকা (চন্দ্র দেবতা), আশতার (শুক্র) যাতে হামীম ও যাতে বা'দা (সূর্যদেবী), হোমস হারমতম বা হারীমত এবং এ ধরনের আরো বহু দেব-দেবীর পূজা করতে শুর“ করে। আলমাকা ছিলো এ জাতির সবচেয়ে বড় দেবতা। তাদের বাদশাহ নিজেকে এ দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করতো। ইয়েমেনে এমন অসংখ্য শিলালিপি পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায়, সমগ্র দেশ উলে- খিত দেবতাবৃন্দ বিশেষ করে আলমাকার মন্দিরে পরিপূর্ণ ছিলো এবং প্রত্যেকটি গুর“ত্বপূর্ণ ঘটনায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতো।

সাবা জাতির আবাসভূমি বর্তমান ইয়েমেন

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইয়েমেন থেকে প্রায় ৩ হাজার শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো সাবা জাতির ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে।[২৩৮]

সাবা জাতির অন্তর্গত কাওমে তুব্বার পরিচয়:

খৃষ্টপূর্ব ১১৫ সনে কাওমে তুব্বা সাবা দেশটি দখল করে এবং ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তা শাসন করে। শত শত বছর ধরে আরবে এদের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী সবার মুখে মুখে ছিলো। এটি ছিলো সাবা জাতিরই অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতি। অন্যান্য উপজাতিদের থেকে এদের লোক সংখ্যা ছিলো অনেক বেশি। তাদের রাজধানী ছিলো যাইদানে। এটি ছিলো কাওমে তুব্বার কেন্দ্র। পরবর্তীকালে এ শহরটি যাফার নামে আখ্যায়িত হয়। বর্তমানে ইয়েমেন শহরের কাছে একটি গোলাকার পর্বতের ওপর এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ ধ্বংসাবশেষ দেখে কোনো ব্যক্তিই ধারণা করতে পারবে না যে, এটি এমন একটি জাতির স্মৃতিচিহ্ন একদিন যার ডংকা নিনাদ সমগ্র বিশ্বে গুঞ্জরিত হতো। এ সময়ই রাজ্যের একটি অংশ হিসেবে ইয়াম্নত ও ইয়াম্নিয়াত শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এটি আরবের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত আসীর থেকে আদদন (এডেন) এবং বাবুল মান্দাব থেকে হাদ্রামাউত পর্যন্ত সমগ্র এলাকার নামে পরিণত হয়।[২৩৯]

সাবা জাতির উত্থান:

সাবা জাতির উত্থান মূলত দুইটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এক, কৃষি এবং দুই, ব্যবসায়। কৃষিকে তারা পানিসেচের একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত করে। প্রাচীন যুগে ব্যবিলন ছাড়া আর কোথাও এর সমপর্যায়ের পানিসেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সে দেশটি প্রাকৃতিক নদী সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলো না। বর্ষা কালে পাহাড় থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হতো। সারা দেশে এ ঝরণাগুলোতে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ বেঁধে তারা কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করতো। তারপর এ হ্রদগুলো থেকে খাল কেটে সারা দেশে এমনভাবে পানি সেচের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো যাকে কুরআন মাজিদের বর্ণনামতে, যেদিকে তাকাও সেদিকেই কেবল বাগ-বগিচা ও সবুজ-শ্যমল গাছ-গাছালি দেখা যেত। এ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় জলধারাটি মারিব নগরীর নিকটবর্তী বালক পাহাড়ের মধ্যস্থলের উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি যখন তাদের ওপর থেকে সরে গেলো তখন পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ বিশাল বাঁধটি ভেঙে গেলো। এ সময় এটা থেকে যে বন্যা সৃষ্টি হলো তা পথের বাঁধগুলো একের পর এক ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চললো, এমনকি শেষ পর্যন্ত দেশের সমগ্র পানিসেচ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং এরপর আর কোনো ভাবেই এ ব্যবস্থা পুনরবহাল করা গেলো না।

২৩৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-১২, পৃ.-১৭৬
২৩৯. প্রাগুক্ত

ব্যবসায়ের জন্যে এই জাতিকে আল-াহ সর্বোত্তম ভৌগলিক স্থান দান করেছিলেন। তারা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এক হাজার বছরের বেশী সময় পর্যন্ড় এ জাতিটিই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসায়ের সংযোগ মাধ্যমের স্থান দখল করে থাকে। একদিকে তাদের বন্দরে চীনের রেশম, ইন্দোনেশিয়া ও মালাবারের গরম মশলা, হিন্দুস্থানের কাপড় ও তলোয়ার, পূর্ব আফ্রিকার যংগি দাস, বানর, উটপাখির পালক ও হাতির দাঁত পৌঁছে যেতো এবং অন্যদিকে তারা এ জিনিসগুলোকে মিসর ও সিরিয়ার বাজারে পৌঁছিয়ে দিত। সেখান থেকে সেগুলো গ্রীস ও রোমে চলে যেত। এ ছাড়াও তাদের নিজেদের এলাকায় ও উৎপন্ন হতো লোবান, চন্দন কাঠ, আম্বর, মিশক, মুর, কারফা, কাসবুখ, যারীরাহ, সালীখাহ ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে। মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও রোমের লোকেরা এগুলো লুফে নিত।

দুটি বড় বড় পথে বিশ্বব্যাপী এই বাণিজ্য চলতো। একটি ছিলো সমুদ্রপথ এবং অন্যটি স্থলপথ। হাজার বছর পর্যন্ড় সমুদ্রপথে ব্যবসায় ছিলো সাবায়ীদের একচেটিয়া দখলে। কারণ লোহিত সাগরের মৌসুমী বায়ু প্রবাহ, ভূগর্ভস্থ পাহাড় ও নোংগর করার স্থান গুলোর গোপন তথ্য একমাত্র তারাই জানত। অন্য কোনো জাতির এই ভয়াল সাগরে জাহাজ চালাবার সাহসই ছিলো না। এই সামুদ্রিক পথে তারা জর্দান ও মিসরের বন্দর সমুহে নিজেদের পন্যদ্রব্য পৌঁছিয়ে দিতো। অন্যদিকে স্থলপথ আদন (এডেন) ও হাদরামাউত থেকে মারিবে গিয়ে মিশত এবং তারপর আবার সেখান থেকে একটি রাজপথ মক্কা, জেদ্দা, ইয়াসরিব, আলউলা, তাবুক ও আইলা হয়ে পেট্রা পর্যন্ড় পৌঁছে যেত। এরপর একটি পথ মিসরের দিকে এবং অন্য পথটি সিরিয়ার দিকে যেত। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, এ স্থলপথে ইয়েমেন থেকে সিরিয়া সীমান্ড় পর্যন্ড় অবিচ্ছিন্নভাবে সাবায়ীদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং তাদের বানিজ্য কাফেলা দিনরাত এ পথে যাওয়া আসা করত। এ উপনবেশগুলোর মধ্যে অনেক গুলোর ধ্বংসাবশেষ এই এলাকায় আজো রয়ে গেছে এবং সেখানে সাবায়ী ও হিময়ারী ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে।

খৃস্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময়ে এ ব্যবসায়ে অধোগতি শুর“ হয়। মধ্যপ্রাচ্যে গ্রীক ও তারপর রোমানদের শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা এই মর্মে শোরগোল শুর“ করে দেয় যে, আরব ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইজারাদারীর কারণে প্রাচ্যের ব্যবসায় পণ্যের ইচ্ছামতো মূল্য আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে, এ ময়দানে অগ্রবর্তী হয়ে এই বাণিজ্য আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম মিসরের গ্রীক বংশোদ্ভূত শাসক দ্বিতীয় বাতলিমূস (২৮৫-২৪৬ খৃষ্টপূর্ব) সেই প্রাচীন খালটি পুনরায় খুলে দেন, যা সতের শো বছর আগে ফেরাউন সিসুস্ত্রীস নীলনদকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করার জন্যে এ খালটি খনন করেছিলো। এ খালের

মাধ্যমে মিসরের নৌবহর প্রথমবার লোহিত সাগরে প্রবেশ করে কিন্তু সাবায়ীদের মোকাবিলায় এই প্রচেষ্টা বেশী কার্যকর প্রমাণিত হতে পারেনি। তারপর রোমানরা যখন মিসর দখল করে তখন তারা লোহিত সাগরে অধিকতর শক্তিশালী বাণিজ্য বহর নিয়ে আসে এবং তার পশ্চাতভাগে একটি নৌবাহিনীও জুড়ে দেয়। এই শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা সাবায়ীদের ছিলো না। রোমানরা বিভিন্ন বন্দরে নিজেদের ব্যবসায়িক উপনিবেশ গড়ে তোলে সেখানে জাহাজের প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে। যেখানে সম্ভব হয় সেখানে নিজেদের সামরিক বাহিনীও রেখে দেয়। শেষ পর্যন্ড় এমন এক সময় আসে যখন এডেনের ওপর রোমানদের সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সুযোগে রোমান ও হাবশী শাসকরা সাবায়ীদের মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে চক্রান্ড় করে। এর ফলে শেষ পর্যন্ড় এই জাতির স্বাধীনতা সূর্যও অস্ড়মিত হয়।

নৌবাণিজ্য বেদখল হয়ে যাবার পর সাবায়ীদের হাতে থেকে যায় শুধুমাত্র স্থলপথের বানিজ্য। কিন্তু নানাবিধ কারণে ধীরে ধীরে তারও কোমর ভেংগে যায়। প্রথমে নাবতীরা পেট্রা থেকে নিয়ে আল'উলা পর্যন্ড় হিজায ও জর্দানের উচ্চ ভূমির সমস্ড় উপনিবেশ থেকে সাবায়ীদেরকে বের করে দেয়। তারপর ১০৬ খৃষ্টাব্দে রোমানরা নাবতী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে হিজাযের সীমান্ড় পর্যন্ড় সিরিয়া ও জর্দানের সমস্ড় এলাকা নিজেদের শক্ত হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। এরপর হাবশা ও রোম সাবায়ীদের পারস্পরিক সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে তাদের ব্যবসাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবার জন্যে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ কারণে হাবশীরা বারবার ইয়েমেনের ব্যাপারে নাক গলাতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ড় সারা দেশ অধিকার করে নেয়।[২৪০]

কাওমে তুব্বার ধ্বংস

৩০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই সাবা জাতির ধ্বংস শুর“ হয়। এ সময় তাদের মধ্যে অনবরত গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষি ব্যবস্থা বরবাদ হয়ে যায়। শেষে জাতীয় স্বাধীনতারও বিলোপ ঘটে। সাবা জাতির অন্ড়র্গত কাওমে তুব্বাসহ বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করে ৩৪০ থেকে ৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ড় ইয়েমেনে হাব্শীদের রাজত্ব চলে। তারপর স্বাধীনতা পুনর“দ্ধার হয় ঠিকই কিন্তু মারিবের বিখ্যাত বাঁধে ফাটল দেখা দিতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ড় ৪৫০ বা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে বাঁধ ভেংগে পড়ে এবং এর ফলে যে মহাপ-াবন হয় তার উলে-খ কুর'আন মজীদে রয়েছে। যদিও এরপর থেকে আবরাহার সময় পর্যন্ড় অনবরত বাঁধের মেরামত কাজ চলতে থাকে তবুও যে জনবসতি একবার স্থানচ্যুত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলো তা আর পুনরায় একতা

---

২৪০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-১২, পৃ.-১৭৮-১৭৯

হতে পারেনি এবং পানি সেচ ও কৃষির যে ব্যবস্থা একবার বিধ্বস্ড় হয়ে গিয়েছিলো তা আর পুনরগঠন সম্ভবপর হয়নি।

এভাবে আল-াহর ক্রোধ এই জাতিকে উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে টেনে নামিয়ে এমন এক গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে যেখান থেকে কোনো অভিশপ্ত জাতি আর কোনো দিন বের হয়ে আসতে পারেনি। একটা সময় এমন ছিলো যখন তাদের সম্পদশালিতার কথা শুনে গ্রীক ও রোমানরা ভীষণভাবে প্রলুব্ধ হতো।

অষ্ট্রাবু লিখেছেন: "তারা সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহার করতো। তাদের গৃহের ছাদ, দেয়াল ও দরজায়ও হাতির দাঁত, সোনা, রূপা ও হীরা জহরতের কারুকাজে পরিপূর্ণ থাকতো।"[২৪১]

প্লিনি লিখেছেন: "রোম ও পারস্যের সম্পদ তাদের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তারা তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। তাদের সবুজ-শ্যামল দেশ বাগ-বাগিচা, ক্ষেত খামার ও গবাদি পশুতে পরিপূর্ণ।"[২৪২]

আর্টি মেড্রোস বলেন: "তারা বিলাসীতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। জ্বালানী কাঠের পরিবর্তে তারা দারুচিনি, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাঁঠ ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, তাদের এলাকার সমুদ্রোপকূল অতিক্রমকারী বিদেশী জাহাজগুলোতেও খোশবুর ছোঁয়াচ পৌঁছে যেত। তারাই ইতিহাসে প্রথমবার সান'আর উচ্চ পার্বত্য স্থান সমূহে আকাশ ছোঁয়া ইমারত নির্মাণ করে। গুমদান প্রাসাদ নামে এগুলো দীর্ঘকাল ধরে প্রসিদ্ধ থাকে। আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী এগুলো ছিলো ২০ তলা বিশিষ্ট ইমারত এবং প্রত্যেকটি তলার উচ্চতা ছিলো ৩৬ ফুট।[২৪৩]

আল-াহর অনুগ্রহ যতদিন তাদের সহযোগী ছিলো ততদিন এসব কিছু ছিলো। শেষে যখন তারা চরমভাবে অনুগ্রহ অস্বীকার করার এবং নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবার পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন মহান সর্বশক্তিমান রবের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাদের ওপর থেকে চিরকালের জন্যে সরে যায় এবং তাদের নাম নিশানা পর্যন্ড়ও মুছে যায়। এই জাতি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যে তাদের বিক্ষিপ্ততা ও বিশৃংখলা প্রবাদে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ড় আল-াহর অনুগ্রহ অস্বীকারকারী এই সাবা জাতি এবং এর উপজাতিগুলো

---

২৪১. প্রাগুক্ত, খন্ড-১২, পৃ.-১৮০

২৪২. প্রাগুক্ত

২৪৩. প্রাগুক্ত

আর দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকেনি। কেবলমাত্র গল্প কাহিনীতেই তার আলোচনা থেকে গেছে।

৭ম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক আসহাবে কাহ্ফ

ঐতিহাসিক আসহাবে কাহ্ফ আল-াহর শক্তিমত্তার এক বিষ্ময়কর প্রকাশ।

পবিত্র কুর’আনে আল-াহ তা’য়ালা যে সমস্ড় ঘটনা উলে-খ করেছেন, তার প্রত্যেকটি ঘটনাতেই আমাদের জন্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কুর’আনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফ বা গুহাবাসীর আশ্চর্যজনক ঘটনাটিও কুর’আনের শিক্ষাণীয় ঘটনাসমূহের অন্যতম একটি ঘটনা। এ ঘটনাটি সৃষ্টিজগতের এবং অনন্য বিষ্ময়কর ঘটনা। পবিত্র কুর’আনে মহান আল-াহ বলেন:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا • إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا • فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا • ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا •

“তুমি কি মনে করো যে, কাহ্ফ এবং রাকিমের অধিবাসীরা আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলির অন্ড়র্ভুক্ত? যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা বলেছিল: ‘আমাদের রব! আমাদের দান করো তোমার পক্ষ থেকে রহমত এবং আমাদেরকে আমাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করে দাও।’ তারপর আমরা তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ড় রেখে দিয়েছিলাম। অতঃপর তাদের জাগিয়েছিলাম একথা জানার জন্যে যে, তাদের দুই দলের মধ্যে কোন্টি তার অবস্থানকাল ঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে?”[২৪৪]

কাহ্ফ বলা হয় পাহাড়ের গর্ত বা গুহাকে। কয়েকজন যুবক যারা নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্যে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদেরকে আসহাবে কাহ্ফ বলা হয়। তাদের ঘটনা অত্যন্ড় আশ্চর্যজন ও খুবই হৃদয়গ্রাহী। আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা মহান রাব্বুল আল-াহ তাঁর শক্তিমত্তার সাহায্যে কয়েকজন লোককে তিনশ বছর পর্যন্ড় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন এবং তারপর তাদেরকে জাগিয়ে তুলেছেন ঠিক তেমনি অবস্থায় যেমন তর“ণ, সুস্থ-সবল ছিলো তারা ঘুমাবার আগে। যারা আল-াহ তা’য়ালার সৃষ্টি নিয়ে চিন্ড়া ভাবনা করে তারা এটা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে যে, আল-াহর জন্যে এটা কোনো কঠিন কাজ নয়।

২৪৪. আল কুরআন, ১৮:০৯-১২

আসহাবে কাহ্‌ফ-এর গুহা

আসহাবে কাহ্‌ফ-এর গুহা

আসহাবে কাহ্ফ -এর বিষ্ময়কর ঘটনা

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى • وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ۖ لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا • هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا •

"আমরা তোমার কাছে তাদের সঠিক ঘটনা বর্ণনা করছি: তারা কয়েকজন যুবক ঈমান এনেছিল তাদের রবের প্রতি এবং আমরা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম তাদের হিদায়াত (ঈমান)। আর আমরা তাদের হৃদয়ের বন্ধন মযবুত করে দিয়েছিলাম। তারা যখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, তখন বলেছিল: "আমাদের রব মহাকাশ ও পৃথিবীর রব! আমরা কখনো তাঁকে ছাড়া আর কোনো ইলাহ্কে ডাকবো না। তেমনটি করলে সেটা হবে এক গর্হিত কাজ। এই আমাদের কাওম, তারা তাঁকে ছাড়া অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছে। তারা তাদের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ হাযির করে না কেন? ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল-াহ্র উপর আরোপ করে?"[২৪৫]

এ কাহিনীর প্রাচীনতম বিবরণ পাওয়া গেছে জেমস সারোজি নামক সিরিয়ার একজন খৃষ্টান পাদরীর বক্তৃতামালায়। তার এই বক্তৃতা ও উপদেশবাণী সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত। আসহাবে কাহ্ফের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ৪৫২ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম হয়। ৪৭৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি নিজের এ বক্তৃতামালা সংকলন করেন। এ বক্তৃতামালায় তিনি আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাবলী বিস্ড়ারিতভাবে বর্ণনা করেন। আমাদের প্রথম যুগের মুফাসসিরগণ এই সুরিয়ানী বর্ণনার সন্ধান পান। ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে এই কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। অন্যদিকে এগুলো ইউরোপেও পৌঁছে যায়। সেখানে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশিত হয়। গিবন তার "রোম সম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস "গ্রন্থের ৩৩ অধ্যায়ে ঘুমন্ড় সাতজন শিরোনামে ঐসব উৎস থেকে এ কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের মুফাসসিরগণের বর্ণনার সাথে এত বেশী মিলে যায় যে, উভয় বর্ণনা একই উৎস থেকে গৃহীত বলে মনে হয়। যেমন যে বাদশাহর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহাভ্যন্ড়রে আশ্রয় নেন আমাদের মুফাসসিরগণ তাঁর নাম লিখেছেন 'দাকায়ানুস' বা 'দাকিয়ানুস' এবং গিবন বলেন, সে ছিলো কাইজার 'ডিসিয়াস'

---

২৪৫. আল কুরআন, ১৮:১৩-১৫

(Decious) । এই বাদশাহ ২৪৯ থেকে ২৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ড় রোম সম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে এবং ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালাবার ব্যাপারে তার আমলই সবচেয়ে বেশী দুর্ণাম কুড়িয়েছে। যে নগরীতে এ ঘটনাটি ঘটে আমাদের মুফাসসিরগণ তার নাম লিখেছেন 'আফসুস' বা 'আফসোস'। অন্যদিকে গিবন তরা নাম লিখেছেন 'এফিসুস' (Ephesus) এ নগরীটি এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে রোমীয়দের সবচেয়ে বড় শহর ও বন্দর নগরী ছিলো। এর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান তুরস্কের 'ইজমীর' (স্মার্ণা) নগরী থেকে ২০-২৫ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়। তারপর যে বাদশাহর শাসনামলে আসহাবে কাহ্‌ফ জেগে উঠেন আমাদের মুফাসরিগণ তার নাম লিখেছেন 'তেযোসিস' এবং গিবন বলেন, তাদের নিদ্রাভংগের ঘটনাটি কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিস (theodosius) এর আমলে ঘটে। রোম সাম্রাজ্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়ার পর ৪০৮ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ড় তিনি রোমের কাইজার ছিলেন। উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে আসহাবে কাহ্‌ফ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাদের যে সাথীকে খাবার আনার জন্যে শহরে পাঠান তার নাম আমাদের মুফাসসিরগণ লিখেছেন 'ইয়ামলিখা' এবং গিবন লিখেছেন 'ইয়াসলিখুস' (lamblchus) ঘটনার বিস্ড়রিত বিবরণের ক্ষেত্রে উভয় বর্ণনা একই রকমের। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, কাইজার ডিসিয়াসের আমলে যখন ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের ওপর চরম নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হচ্ছিলো তখন এই সাতজন যুবক একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর কাইজার থিয়োডোসিসের রাজত্বের ৩৮ তম বছরে অর্থাৎ প্রায় ৪৪৫ বা ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে তারা জেগে উঠেছিলেন। এ সময় সমগ্র রোম সাম্রাজ্য ছিলো ঈসা (আ.)-এর দীনের অনুসারী। সেই হিসেবে গুহায় তাদের ঘুমানোর সময় ধরা যায় প্রায় ১৯৬ বছর। কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ এ কাহিনীটিকে আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী বলে মেনে নিতে এজন্যে অস্বীকার করেছেন যে, সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে কুরআন তাদের গুহায় অবস্থানের সময় ৩০৯ বছর বলে বর্ণনা করছে।[২৪৬]

এ সুরিয়ানী বর্ণনা ও কুরআনের বিবৃত্তির মধ্যে সামান্য বিরোধও রয়েছে। এরি ভিত্তিতে গিবন নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-ামের বির"দ্ধে "অজ্ঞতা"র অভিযোগ এনেছেন। অথচ যে বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি এতবড় দুঃসাহস করছেন তার সম্পর্কে তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, সেটি এ ঘটনার তিরিশ চলি-শ বছর পর সিরিয়ার এক ব্যক্তি লেখেন। আর এতো বছর পর নিছক জনশ্র"তির মাধ্যমে একটি ঘটনার বর্ণনা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছুতে পৌঁছুতে কিছু না কিছু বদলে যায়। এ ধরনের

---

২৪৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০৭, পৃ.-১৮২-১৮৩

একটি ঘটনার বর্ণনাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য মনে করা এবং তার কোনো অংশের সাথে বিরোধ হওয়াকে নিশ্চিতভাবে কুরআনের ভ্রান্তিড় বলে মনে করা কেবলমাত্র এমনসব হঠকারী লোকের পক্ষেই শোভা পায় যারা ধর্মীয় বিদ্বেষ বশে বুদ্ধিমত্তার সামান্যতম দাবীও উপেক্ষা করে যায়।[২৪৭]

আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাটি ঘটে আফসোস (Ephesus) নগরীতে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় এগারো শতকে এ নগরীটির পতন হয়। পরবর্তীকালে এটি মূর্তিপূজার বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার লোকেরা চাঁদ বিবির পূজা করতো। তাকে বলা হতো ডায়না (diana)। এর সুবিশাল মন্দিরটি প্রাচীন যুগের দুনিয়ার অত্যাশ্চর্য বিষয় বলে গণ্য হতো। এশিয়া মাইনরের লোকেরা তার পূজা করতো। রোমান সাম্রাজ্যেও তাকে উপাস্যদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয় ।

হযরত ঈসা (আ.)-এর পর যখন তাঁর দা'ওয়াত রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছুতে শুরু করে তখন এ শহরের কয়েকজন যুবকও শিরক থেকে তাওবা করে এক আল-াহর প্রতি ঈমান আনে। খৃষ্টীয় বর্ণনাবলী একত্র করে তাদের ঘটনার যে বিস্তড়রিত বিবরণ গ্রেগরী অব টুরস (Gregory of tours) তাঁর গ্রন্থে (Meraculorum liber) বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

তারা ছিলেন সাতজন যুবক। তাদের ধর্মান্তড়রের কথা শুনে কাইজার ডিসিয়াস তাদের নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ধর্ম কি? তারা জানতেন, কাইজার ঈসার অনুসারীদের রক্তের পিপাসু। কিন্তু তারা কোনো প্রকার শংকা না করে পরিস্কার বলে দেন, আমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদকে আমরা ডাকি না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে অনেক বড় গুনাহ করবো। কাইজার প্রথমে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমাদের মুখ বন্ধ করো, নয়তো আমি এখানেই তোমাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করবো। তারপর কিছুক্ষণ থেকে বললেন, তোমরা এখনো শিশু। তাই তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি তোমরা নিজেদের মত বদলে ফেলো এবং জাতির ধর্মের দিকে ফিরে আসো তাহলে তো ভালো, নয়তো তোমাদের শিরশ্চেদ করা হবে |

"এ তিন দিনের অবকাশের সুযোগে এ সাতজন যুবক শহর ত্যাগ করেন। তারা কোনো গুহায় লুকা'বার জন্যে পাহাড়ের পথ ধরেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথে চলতে থাকে। তারা কুকুরটাকে তাদের পিছু নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্যে বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কিছুতেই তাদের সংগ ত্যাগ করতে রাযি হয়নি। শেষে একটি বড় গভীর বিস্তৃত

২৪৭. প্রাগুক্ত, খন্ড-০৭, পৃ.-১৮৩

গুহাকে ভাল আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কুকুরটি গুহার মুখে বসে পড়ে। দারুন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকার কারণে তারা সবাই সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়েন। এটি ২৫০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ১৯৭ বছর পর ৪৪৭ খৃষ্টাব্দে তারা হঠাৎ জেগে উঠেন। তখন ছিলো কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিসের শাসনামল। রোম সাম্রাজ্য তখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলো এবং আফসোস শহরের লোকেরাও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিলো।"

"এটা ছিলো এমন এক সময় যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরের জীবন এবং কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে জমায়েত ও হিসেব নিকেশ হওয়া সম্পর্কে প্রচন্ড মতবিরোধ চলছিলো। আখেরাত অস্বীকারকারীদের ধারণা লোকদের মন থেকে কিভাবে নির্মূল করা যায় এ ব্যাপারটা নিয়ে কাইজার নিজে বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি আল-াহর কাছে দোয়া করেন যেন তিনি এমন কোনো নিদর্শন দেখিয়ে দেন যার মাধ্যমে লোকেরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। ঘটনাক্রমে ঠিক এ সময়েই এই যুবকরা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন।"

"জেগে ওঠেই তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি? কেউ বলেন একদিন, কেউ বলেন দিনের কিছু অংশ। তারপর আবার একথা বলে সবাই নীরব হয়ে যান যে এ ব্যাপারে আল-াহই ভাল জানেন। এরপর তারা জীন (Jean) নামে নিজেদের একজন সহযোগীকে রূপার কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার আনার জন্যে শহরে পাঠান। লোকেরা যাতে চিনতে না পারে এজন্যে তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন। তারা ভয় করছিলেন, লোকেরা আমাদের ঠিকানা জানতে পারলে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে এবং ডায়নার পূজা করার জন্যে আমাদের বাধ্য করবে। কিন্তু জীন শহরে পৌঁছে সবকিছু বদলে গেছে দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন সবাই ঈসায়ি হয়ে গেছে এবং ডায়না দেবীর পূজা কেউ করছে না। একটি দোকানে গিয়ে তিনি কিছু রুটি কিনেন এবং দোকনদারকে একটি রূপার মুদ্রা দেন। এ মুদ্রার গায়ে কাইজার ডিসিয়াসের ছবি ছাপানো ছিলো। দোকানদার এ মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে যায়। সে জিজ্ঞস করে, এ মুদ্রা কোথায় পেলে? জীন বলে এ আমার নিজের টাকা, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসিনি। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। লোকদের ভীড় জমে ওঠে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নগর কোতোয়ালের কাছে পৌঁছে যায়। কোতোয়াল বলেন, এ গুপ্ত ধন যেখান থেকে এনেছো সেই জায়গাটা কোথায় আমাকে বলো। জীন বলেন, কিসের গুপ্ত ধন? এ আমার নিজের টাকা। কোনো গুপ্তধনের কথা আমার জানা নেই। কোতোয়াল বলেন, তোমার একথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তুমি যে

মুদ্রা এনেছো, এতো কয়েক শো বছরের পুরানো। তুমি তো সবেমাত্র যুবক, আমাদের বুড়োরাও এ মুদ্রা দেখেনি।

নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। জীন যখন শোনেন কাইজার ডিসিয়াস মারা গেছে বহুযুগ আগে, তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর্যন্ড় তিনি কোনো কথাই বলতে পারেন না। তারপর আস্েড় আস্েড় বলেন, এ তো মাত্র কালই আমি এবং আমার ছয়জন সাথী এ শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং ডিসিয়াসের যুল্ম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জীনের একথা শুনে কোতোয়ালও অবাক হয়ে যান। তিনি তাকে নিয়ে যেখানে তার কথা মতো তারা লুকিয়ে আছেন সেই গুহার দিকে চলেন। বিপুল সংখ্যক জনতাও তাদের সাথী হয়ে যায়। তারা যে যথাযর্থই কাইজার ডিসিয়াসের আমলের লোক সেখানে পৌঁছে এ ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায়। এ ঘটনার খবর কাইজার ডিসিয়াসের কাছেও পাঠানো হয়। তিনি নিজে এসে তাদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের থেকে বরকত গ্রহণ করেন। তারপর হঠাৎ তারা সাতজন গুহার মধ্যে গিয়ে সটান শুয়ে পড়েন এবং তাদের মৃত্যু ঘটে। এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে লোকেরা যথাযর্থই মৃত্যুর পরে জীবন আছে বলে বিশ্বাস করে। এ ঘটনার পর কাইজারের নির্দেশে গুহায় একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করা হয়।[২৪৮]

যুবকগণ যখন সাচ্চা দিলে ঈমান আনলো তখন আল-াহ তাদের সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের পথে অবিচল থাকার সুযোগ দিলেন।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا • وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا •

"তুমি দেখতে পাও, তারা তাদের গুহার প্রশস্ড় চত্বরে অবস্থান করছে, উদয়ের সময় সূর্য তাদের ডান পাশ হেলে যায়, আর অস্ড় যাবার সময় তাদের অতিক্রম করে বাম পাশ

২৪৮. প্রাগুক্ত, খন্ড-০৭, পৃ.-১৮৪-১৮৫

থেকে। এটা আল-াহ্র নিদর্শনসমূহের অন্ড়র্ভুক্ত। আল-াহ্ যাকে সঠিক পথ দেখান সেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন, তুমি কখনো তার জন্যে কোনো মুরশিদ অলি (সঠিক পথের দিশারি অভিভাবক) পাবে না। তুমি ধারণা করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা ঘুমন্ড়। আমরা তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে এবং বাম দিকে, আর তাদের কুকুরটি ছিলো সামনের পা দুটি গুহা দ্বারের দিকে প্রসারিত করে। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে তুমি পেছন ফিরে পালাবে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ড় হয়ে পড়বে।"[২৪৯]

দিনের পর আসে রাত। রাতের পর দিন। পার হয়ে গেল বছরের পর বছর। যুকবগণ শুয়ে আছে। গভীর নিদ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাইরের কর্মব্যস্ড় জীবনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আকাশে বিজলীর গর্জন, বাতাসের প্রচন্ডতা এবং পৃথিবীর কোনো ঘটনাই তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। সূর্য উদিত হওয়ার সময় ডান পাশে হেলে গিয়ে গুহার ছিদ্র দিয়ে সামান্য আলো প্রবেশ করে এবং আল-াহর হুকুমে তাদেরকে সামান্য আলো ও তাপ প্রদান করে। কিন্তু সূর্যের প্রখর উত্তাপ তাতে প্রবেশ করে না। আল-াহর ইচ্ছায় তাদের শরীরকে হেফাজতের জন্যে অস্ড় যাওয়ার সময়ও সূর্য একটু বাম দিকে হেলে যায়। কুকুরটি তার দুই বাহু প্রসারিত করে বীরের মতো প্রহরীর কাজে গুহার বাইরে অবস্থানরত। পাহাড়ের মধ্যে একটি অন্ধকার গুহায় কয়েকজন লোকের এভাবে অবস্থান করা এবং সামনের দিকে কুকুরের বসে থাকা এমন একটি ভয়াবহ দৃশ্য পেশ করে যে, উঁকি দিয়ে যারা দেখতে যেতো তারাই তাদেরকে ডাকাত মনে করে ভয়ে পালিয়ে যেতো। এ জন্যেই লোকেরা এতো দীর্ঘদিন পর্যন্ড় তাদের সম্পর্কে জানতে পারেনি।[২৫০]

মহান আল-াহ রাব্বুল আ'লামীন গুহাবাসীদেরকে ডান- বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়েছিলেন। যাতে তাদের শরীর দীর্ঘদিন একদিকে চেপে থাকার কারণে বিকৃত না হয় এবং মাটিতে এতো দীর্ঘ সময় কোনো একদিকে চাপ পড়ার ফলে তা ডেবে না যায়। মহান রাব্বুল আ'লামীন ছাড়া আর কারো পক্ষে এতো গভীর চিন্ড়া করা সম্ভব! সুবাহানাল-াহ।

আর এতো দীর্ঘকাল খাদ্যদ্রব্য ছাড়া বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের শরীরকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রাখা- মহান আল-াহ তা'য়ালার অশেষ ক্ষমতা ও নিদর্শনের অংশমাত্র।

মহান আল-াহ বলেন:

২৪৯. আল কুর'আন, ১৮:১৭-১৮

২৫০. শাইখ আবদুল-াহ শাহেদ, ঐতিহাসিক আসহাবে কাহাফের ঘটনা ও তার শিক্ষা (Preaching Authentic Islam in Bangla, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا •

"তুমি বলো: 'এরপরে তারা কতোকাল ছিলো তা আল-াহ্ই ভালো জানেন।' মহাকাশ আর পৃথিবীর গায়েব কেবল তাঁরই জানা আছে। দেখো, তিনি কতো সুন্দর দ্রষ্টা এবং শ্রোতা! তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো অলি নেই। তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরিক করেন না।"২৫১

গভীর নিদ্রায় পার হয়ে গেলো তিনশ নয় বছর। যুবকগণ ক্ষুধা ও পিপাসায় দুর্বল শরীর নিয়ে জেগে উঠেছিলেন। তারা উঠে ভাবলেন, সময় বেশি অতিক্রম হয়নি এবং ইতিহাসের চাকা গুহার মুখেই থমকে রয়েছে।

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا • إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا •

"এভাবেই, আমরা তাদের জাগিয়ে তুলেছিলাম যেনো তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা এখানে কতোদিন অবস্থান করেছো? বাকিরা বললো: "আমরা এখানে একদিন বা আধা দিন অবস্থান করেছি।' তারা বললো: তোমাদের রবই অধিক জানেন তোমরা কতদিন অবস্থান করেছো? এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রা নিয়ে শহরে পাঠাও, সে দেখুক কোন্ খাবার উত্তম এবং তা থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসুক তোমাদের জন্যে। আর সে যেনো সতর্কতা অবলম্বন করে এবং কিছুতেই যেনো তোমাদের সম্পর্কে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। তোমাদের বিষয়টি যদি তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তারা তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করবে, অথবা তোমাদের ফিরিয়ে নেবে তাদের মিল-াতে। তখন আর তোমরা কখনো সফলতা অর্জন করবে না।"২৫২

গুহাবাসী যুবকরা বুঝতে পারলো না, আসলে তারা কতদিন ঘুমিয়েছিলো। তারা তাদের কাছে কিছু দিরহাম ছিলো, সেগুলো দিয়ে নিজের পরিচয় গোপন রেখে একজনকে কিছু খাবার কিনে আনতে শহরে পাঠানোর সিদ্ধান্ড় নিলো। তারা ভয় পাচ্ছিলো যে, তাদের জাতির লোকেরা তাদের কথা জেনে গেলে পুনরায় তাদেরকে জোর করে তাদেরকে শিরকের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। অথবা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে ছদ্মবেশে এবং ভিন্ন একটা পথে শহরে

২৫১. আল কুর'আন, ১৮:২৬
২৫২. আল কুর'আন, ১৮:১৯-২০

পাঠায় কিছু খাবার কিনে আনার জন্যে। ঐ গুহাবাসী যুবকটি বের হয়ে দেখেন যে, শহরের কোনো জিনিসই আর আগের মতো নেই। আর শহরের সব লোক তার অপরিচিত। তাকে কেউ চিনতে পারছে না, তিনিও কাউকে চিনতে পারছেন না। অতঃপর তিনি একটি দোকানে গিয়ে কিছু মুদ্রা দেন ও এর বিনিময়ে খাবার চান। দোকানদার ঐ মুদ্রা দেখে কঠিন বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তার প্রতিবেশী অন্য দোকানদারকে সেগুলো দেখতে দেন। এভাবে তারা সবাই অনেক পুরনো এ মুদ্রাগুলো দেখে আশ্চার্যান্বিত হন। সবাই ভাবতে থাকে লোকটি পুরনো দিনের কোনো গুপ্তধন পেয়েছে। সুতরাং তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ মুদ্রাগুলো সে কোথায় পেলো? তখন সে বললো, আমি এ শহরের লোক। এখানকার বাদশাহ হচ্ছে দাকিয়ানুস। শেষ পর্যন্ড় তাঁকে নগর শাসকের হাতে সোপর্দ করা হলো। সেখানে গিয়ে রহস্যভেদ হলো যে, দু'শো বছর আগে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্যে পালিয়েছিলেন এই ব্যক্তি তাদেরই একজন। এ খবর শহরের ঈসায়ি অধিবাসীদের মধ্যে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে শাসকের সাথে বিপুল সংখ্যক জনতাও গুহায় পৌঁছে গেলো। গুহাবাসী যুবকটি জনতা থেকে পৃথক হওয়া মাত্রই আল-াহ তাদের ও গুহাবাসীর মাঝে একটি ‘গায়েবী’ বা অদৃশ্য পর্দা নিক্ষেপ করলেন। লোকেরা আর জানতে পারলোনা তিনি কোথায় গেলেন। এভাবে আল-াহ তা’য়ালা আসহাবে কাহাফের রহস্য মানুষের কাছে গোপন করলেন। অতঃপর আল-াহ আসহাবে কাহাফের লোকদের গুহার ভেতরে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করেন।[২৫৩]

২৫৩. ‘আসহাবে কাহাফ’ বা গুহাবাসী যুবকদের কাহিনী (ansarus-sunnah.blogspot.com, ১৭ অক্টোবর ২০১৫)

আসহাবে কাহ্‌ফ -এর সংখ্যা

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا •

"তোমাদের বিষয়টি যদি তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তারা তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করবে, অথবা তোমাদের ফিরিয়ে নেবে তাদের মিল-াতে। তখন আর তোমরা কখনো সফলতা অর্জন করবে না।"[২৫৪]

এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনার পৌনে তিনশো বছর পরে কুর'আন নাযিলের সময় এই বিস্ড়ারিত বিবরণ সম্পর্কে খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত ছিলো৷ তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সাধারণ লোকদের জানা ছিলো না৷ আসলে তখন তো ছাপাখানার যুগ ছিলো না৷ কাজেই যেসব বইতে তাদের সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশী সঠিক তথ্যাদি ছিলো সেগুলো সাধারণভাবে প্রকাশ করার কোনো সুযোগ ছিলো না৷ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৌলিক বর্ণনার সাহায্যে ঘটনাবলী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো এবং সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তাদের বহু বিবরণ গল্পের রূপ নিতো৷ তবুও যেহেতু তৃতীয় বক্তব্যটির প্রতিবাদ আল-াহ করেননি তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সঠিক সংখ্যা সাতই ছিলো৷[২৫৫]

এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সংখ্যাটি আসল নয় বরং আসল জিনিস হচ্ছে এই কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা৷ এই কাহিনী থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, একজন সাচ্চা মুমিনের কোনো অবস্থায়ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং মিথ্যার সামনে মাথা নত করে দেবার জন্যে তৈরি থাকা উচিত নয়৷ এ থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুমিনের ভরসা দুনিয়াবী উপায় উপকরণের উপর নয় বরং আল-াহর উপর থাকতে হবে এবং সত্যপথানুসারী হবার জন্যে বাহ্যত পরিবেশের মধ্যে কোনো অনুকূল্যের চিহ্ন না দেখা গেলেও আল-াহর উপর ভরসা করে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে৷ এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, "প্রচলিত নিয়ম"কে লোকেরা "প্রাকৃতিক আইন" মনে করে এবং এ আইনের বির"দ্ধে দুনিয়ায় কিছুই হতে পারে না বলে ধারণা করে, আসলে আল-াহর মোটেই তা মেনে চলার প্রয়োজন নেই৷ তিনি যখনই এবং যেখানেই চান এ নিয়ম পরিবর্তন করে যে অস্বাভাবিক কাজ করতে চান করতে পারেন৷ কাউকে দু'শো বছর ঘুম পাড়িয়ে এমনভাবে জাগিয়ে

---

২৫৪. আল কুর'আন, ১৮:২২

২৫৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০৭, পৃ.-১৯২

তোলা যে, সে যেন মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েছে এবং তার বয়স, চেহারা-সুরত, পোশাক, স্বাস্থ্য তথা কোনোকিছুর ওপর একালের বিবর্তনের কোনো প্রভাব না পড়া, এটা তাঁর জন্যে কোনো বড় কাজ নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানব জাতির অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ড় বংশধরদেরকে একই সংগে জীবিত করে উঠিয়ে দেয়া, যে ব্যাপারে নবীগণ ও আসমানি কিতাবগুলো আগাম খবর দিয়েছে, আল-াহর কুদরতের পক্ষে মোটেই কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষেরা কিভাবে প্রতি যুগে আল-াহর নিদর্শনসমূহকে নিজেদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শিক্ষার সম্পদে পরিণত করার পরিবর্তে উল্টা সেগুলোকে নিজেদের বৃহত্তর ভ্রষ্টতার মাধ্যমে পরিণত করতো। আসহাবে কাহ্ফের অলৌকিক ঘটনা আল-াহ মানুষকে এ জন্যে দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ তার মাধ্যমে পরকাল বিশ্বাসের উপকরণ লাভ করতে, ঠিক সেই ঘটনাকেই তারা এভাবে গ্রহণ করলো যে, আল-াহ তাদেরকে পূজা করার জন্যে আরো কিছু সংখ্যক অলী ও পূজনীয় ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন। এ কাহিনী থেকে মানুষকে এ আসল শিক্ষাগুলো গ্রহণ করা উচিত এবং এর মধ্যে এগুলোই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো বিষয়। এ বিষয়গুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এ মর্মে অনুসন্ধান ও গবেষণা শুর— করে দেয়া যে, আসহাবে কাহ্ফ কতজন ছিলেন, তাদের নাম কি ছিলো, তাদের কুকুরের গায়ের রং কি ছিলো এসব এমন ধরনের লোকের কাজ যারা ভেতরের শাঁস ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের ছাল নিয়ে নাড়াচাড়া করা পছন্দ করে। তাই মহান আল-াহ নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-ামকে এবং তাঁর মাধ্যমে মুমিনদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি অন্য লোকেরা এ ধরনের অসংলগ্ন বিতর্কের অবতারণা করেও তাহলে তোমরা তাতে নাক গলাবে না এবং এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সময় নষ্ট করবে না। বরং কেবলমাত্র কাজের কথায় নিজেদের সময় ক্ষেপন করবে। এ কারণেই আল-াহ নিজেও তাদের সঠিক সংখ্যা বর্ণনা করেননি। এর ফলে আজে বাজে বিষয়ের মধ্যে নাক গলিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে যারা অভ্যস্ড় তারা নিজেদের এ অভ্যাসকে জিইয়ে রাখার মাল মসলা পাবে না।[২৫৬]

---

২৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৯২-১৯৪

গুহাবাসীদের গুহায় অবস্থানের মেয়াদ

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا • قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا •

"তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশ' বছর আরো নয় বছর। তুমি বলো: 'এরপরে তারা কতোকাল ছিলো তা আল-াহ্ই ভালো জানেন।' মহাকাশ আর পৃথিবীর গায়েব কেবল তাঁরই জানা আছে। দেখো, তিনি কতো সুন্দর দ্রষ্টা এবং শ্রোতা! তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো অলি নেই। তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরিক করেন না।"[২৫৭]

আল-াহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে ঐ সময়কালের খবর দিচ্ছেন যে সময়কাল পর্যন্ড় গুহাবাসীরা তাঁদের গুহার মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করেছিলেন। ঐ সময়কাল ছিলো সূর্যের হিসেবে তিনশ' বছর এবং চন্দ্রের হিসেবে তিনশ' নয় বছর প্রকৃতপক্ষে শামসী ও কামরী বছরের মধ্যে প্রতি একশ বছরের তিন বছরের পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর নয় বছর আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৫৮]

কাতাদা (রা.) বলেন যে, 'তাঁরা গুহায় তিনশ' বছর ছিলেন' এটা আহলে কিতাবের উক্তি। আল—াহ তা'য়ালা এ উক্তিটি খন্ডন করেছেন এবং বলেছেন; এর পূর্ণ এবং সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল-াহরই রয়েছে।

হযরত আবদুল—াহ (রা.) হতেও এ অর্থের কিরআত বর্ণিত আছে। কিন্তু কাতাদা (রা.)র উক্তিটি বিবেচনাধীন। কেননা আহ্লে কিতাবের মধ্যে শামসী বছরের প্রচলন রয়েছে এবং তারা গুহাবাসীদের অবস্থানের সময়কাল তিনশ' বছর মেনে থাকে। তিনশ' নয় বছর তাদের উক্তি নয়। যদি এটা তাদেরই উক্তি হতো, তবে আল-াহ তা'য়ালা একথা বলতেন না যে, তারা তিনশ' বছর ঘুমিয়েছিলো এবং আরো নয় বছর বেশি করেছিলো। বাহ্যতঃ এটাই ঠিক মনে হচ্ছে যে, স্বয়ং আল-াহ তা'য়ালা এটার খবর দিচ্ছেন, কারো উক্তি তিনি বর্ণনা করছেন না। এটাই ইমাম ইবন্ জারী (রা.) গ্রহণ করেছেন। কাতাদা (রা.) -এর রিওয়াইয়াত এবং মাসউদ (রা.) এর কিরআত দুটোই অতি বিরল।[২৫৯]

---

২৫৭. আল কুর'আন, ১৮:২৫-২৬

২৫৮. ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, খন্ড-১৪, পৃ.-২৮

২৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৯

আসহাবে কাহ্ফের সমাধি সৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ড় ও আল-াহর ক্ষোভ

গুহাবাসীগণের রূহ চলে যাওয়ার পর শাসক ও জনগণ সিদ্ধান্ড় নিলো তারা সেই গুহায় সমাধি বা মসজিদ নির্মাণ করবে। এ ঘটনাটি পর্যালোচনা করে মহান আল-াহ বলেন:

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا •

"এভাবেই আমরা মানুষকে তাদের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা জানতে পারে যে, আল-াহ্র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমনে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে বিতর্ক করছিলো, তখন অনেকে বলেছিলো: 'তাদের উপর একটি সৌধ নির্মাণ করো।' তাদের রবই তাদের বিষয়ে ভালো জানেন। নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হয়ে দেখা দিলো, তারা বললো: 'আমরা অবশ্যি তাদের পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করবো।"[২৬০]

খৃষ্টানরা আল-াহর মূল শিক্ষা গ্রহণ না করে অন্যদিকে চলে যাওয়ায় আল-াহ প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এখানে রোম সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং খৃষ্টীয় গীর্জার ধর্মীয় নেতৃবর্গের কথা বলা হয়েছে, যাদের মোকাবিলায় সঠিক আকিদা- বিশ্বাসের অধিকারী ঈসায়ীদের কথা মানুষের কাছে ঠাঁই পেতো না। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাধারণ খৃষ্টানদের মধ্যে বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক গীর্জাসমূহে শিরক, আউলিয়া পূজা ও কবর পূজা পুরো জোরেশোরে শুর" হয়ে গিয়েছিলো। বুযর্গদের আস্ড়ানা পূজা করা হচ্ছিলো এবং ঈসা, মরিয়াম ও হাওয়ারীগণের প্রতিমূর্তি গীর্জাগুলোতে স্থাপন করা হচ্ছিলো। আসহাবে কাহ্ফের নিদ্রাভংগের মাত্র কয়েক বছর আগে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি কাউন্সিল এই এফিসুসে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সেখানে হযরত ঈসা আলইহিস সালামের আল-াহ হওয়া এবং হযরত মরিয়ামের (আ.) "আল-াহ- মাতা" হওয়ার আকীদা চার্চের সরকারী আকিদা হিসেবে গণ্য হয়েছিলো। এই ইতিহাস সামনে রাখলে পরিস্কার জানা যায়, যাদেরকে

২৬০. আল কুর'আন, ১৮:২১

প্রাধান্য লাভকারী বলা হয়েছে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঈসার সাচ্চা অনুসারীদের মোকাবিলায় তৎকালীন খৃষ্টান জনগণের নেতা এবং তাদের শাসকের মর্যাদার অধিষ্ঠিত ছিলো এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী যাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো। মূলত এরাই ছিলো শিরকের পতাকাবাহী এবং এরাই আসহাবে কাহ্ফের সমাধি সৌধ নির্মাণ করে সেখানে মসজিদ তথা ইবাদাতখানা নির্মান করার সিদ্ধান্ড় নিয়েছিলো।[২৬১]

মুসলিমদের মধ্যে কিছু লোক কুরআন মজিদের এ আয়াতটির সম্পূর্ণ উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছে। তারা এ থেকে প্রমাণ করতে চান যে, সাহাবীগণের কবরের ওপর সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ জায়েয। অথচ কুরআন এখানে তাদের এ গোমরাহীর প্রতি ইংগিত করছে, এ জালেমদের মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরকাল অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি করার জন্যে তাদের যে নিদর্শন দেখানো হয়েছিলো তাকে তারা শিরকের কাজ করার জন্যে আল-াহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে নেয় এবং ভাবে যে, ভালই হলো পূজা করার জন্যে আরো কিছু আল-াহর অলি পাওয়া গেলো। তাছাড়া এ আয়াত থেকে "সালেহীন" লোকদের কবরের ওপর মসজিদ তৈরি করার প্রমাণ কেমন করে সংগ্রহ করা যেতে পারে যখন নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-ামের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।[২৬২]

---

২৬১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খন্ড-০৭, পৃ.-১৯০
২৬২. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৯১

আসহাবে কাহ্ফ এর ঘটনা: একটি শিক্ষনীয় নিদর্শন

রহমতের নিদ্রায় আচ্ছন্ন গুহাবাসীদের ঘটনা মানব জাতির জন্যে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন। যে অদ্ভুত পদ্ধতিতে তাদেরকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিলো এবং দুনিয়াবাসীকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখা হয়েছিলো তা মহান আল-াহ শক্তিমত্তার এক বিষ্ময়কর প্রকাশ।

মহান আল-াহ রাব্বুল আ'লামীন যেভাবে দুশো/তিনশো বছর পর মানুষকে ঘুম থেকে তুলতে পারেন তেমনি শত সহস্র বছর পূর্বের মৃত ব্যক্তিদের পুনর"খান ঘটানো তাঁর জন্যে খুবই সামান্য ব্যাপার। বুদ্ধিমানরা এ থেকে সহজেই বুঝতে পারে, আল−াহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই।

সৃষ্টির স্রষ্টা এবং হুকুমের মালিক মহান আল-াহ। তাঁর আদেশকে প্রতিরোধ করার মতো কেউ নেই। কোনো কাজ ও কোনো কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। আসহাবে কাহ্ফ -এর কাহিনী থেকে ঈমানদারদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি কাফেররা সীমাহীন ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী হয়ে গিয়ে থাকে এবং তাদের যুল্‌ম-নির্যাতনের ফলে সমাজে একজন মুমিন শ্বাসগ্রহণ করারও অধিকার হারিয়ে বসে তবুও বাতিলের সামনে মাথা নত করা উচিত নয়। আল-াহর ওপর ভরসা করে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত।

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী আখিরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার একটি প্রমাণ। যেভাবে আল-াহ তা'য়ালা আসহাবে কাহ্ফকে মৃত্যু নিদ্রায় বিভোর করে রাখার পর আবার জীবিত করে তোলেন ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পর পুনর"জ্জীবন করাও আল−াহর ক্ষমতার বাইরে নয়।

৮ম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর অবাধ্য লোভী কারূনের করুণ পরিণতি

কারূনের পরিচয়

কারূন ছিলো ফেরাউনের একজন বিশ্বস্ত পরিষদ। বাইবেল ও তালমূদে কারূনকে কোরহ (Korah) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে ছিলো হযরত মূসা (আ.) -এর চাচাতো ভাই।

বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে যে বংশধারা বর্ণনা করা হয়েছে, তার দৃষ্টিতে বলা যায় হযরত মূসা ও কারূনের পিতা উভয়ে ছিলো পরস্পর সহোদর ভাই।[২৬৩]

কুর'আনে বলা হয়েছে, এই ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব অর্থলোভে ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়েছিলো এবং তার নৈকট্য লাভ করে কারূন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, মূসা (আ.) এর দাওয়াতের মোকাবেলায় ফেরাউনের পরে বিরোধিতার ক্ষেত্রে যে দু'জন প্রধান দলপতি বেশি অগ্রসর হয়েছিলো তাদের একজন ছিলো এই কারূন।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ • إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ •

"যে কেউ কোনো মন্দ কাজ করবে, তাকে ততোটুকু প্রতিফলই দেয়া হবে। কিন্তু যে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ্ করবে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। সেখানে তাদের রিযিক দেয়া হবে বেহিসাব।"[২৬৪]

কারূন নিজের সম্প্রদায়ের বিরূদ্ধাচরণ করে এমন শত্রু শক্তির ধামাধারায় পরিণত হয়েছিলো যে সে বনী ইসরাঈলকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো। আর এ বিশ্বাসঘাতকতার বদৌলতে ফেরাউনের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কারূন এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছিলো।

কারূনের ধন-সম্পদ

প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলো এই কারূন। কিন্তু কার্পণ্যে তার তুল্য কেউ ছিলো না। তার সম্পদের বাক্স পেটরার চাবি বহন করার জন্যে ৩০০ গাধার প্রয়োজন হতো। সে ছিলো তৎকালের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি।[২৬৫]

---

২৬৩. অধ্যায়: ০৬, শোলাক: ১৮-২১

২৬৪. আল কুর'আন, ৪০:২৩-২৪

২৬৫. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, প্রকাশকাল: ১৯৯৯), পৃ.-১০০

কারূনের বিশ্বাস ছিলো, সে তার যোগ্যতা বলে অঢেল সম্পদ অর্জন করেছে। তার প্রাসাদ ছিলো সোনার পাতে তৈরি। আর প্রাসাদের দরজা ছিলো নিরেট সোনার তৈরি। তার এ অর্থ-সম্পদ সে কোনো ভালো কাজে ব্যবহার করতো না। কারূনের কাছে তার এ অর্থ-সম্পদ প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিলো।

কারূনের সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ • وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ •

"কারূণ ছিলো মূসার কাওমেরই একজন। সে তাদের বির়দ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। তাকে আমরা দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও ছিলো কষ্টসাধ্য। তার কাওম তাকে বলেছিল: "দম্ভ করো না, আল-াহ্ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। আল-াহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর সন্ধান করো। দুনিয়ায় তোমার দায়িত্বের অংশ ভুলে যেয়ো না। মানুষের প্রতি ইহ্সান করো, যেভাবে আল-াহ্ ইহ্সান করেছেন তোমার প্রতি। দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করো না। নিশ্চয়ই আল-াহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।"[২৬৬]

কারূনের মধ্যে খোদাভীতির নামগন্ধও ছিলো না। শেষ বিচার ও পরকাল সম্পর্কে সে ছিলো উদাসীন। সে তার ধন সম্পদ নিয়ে অহংকার করতো। সে ভুলে গিয়েছিলো যে, তার চেয়েও সম্পদশালী বহু সম্প্রদায়কে আল-াহ তা'য়ালা অতীতে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ঐসব লোক তাদের সম্পদ কৃপণের মতো ব্যবহার করতো।

এসব লোকের পরিণাম সম্পর্কে মহান আল-াহ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ •

---

২৬৬. আল কুর'আন, ২৮:৭৬-৭৭

“সে বললো: ‘এসব সম্পদ আমি লাভ করেছি আমার বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে।’ সে কি জানে না, আল-াহ্ তার আগেও বহু মানব প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা ছিলো শক্তিতে তার চাইতেও প্রবল এবং তাদের জনসংখ্যাও ছিলো অধিক। অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করা হবে না তারা কী অপরাধ করেছিল?”[২৬৭]

ধ্বংস হলো কারূন

শেষ পর্যন্ড় কারূনের বেলায়ও ঘটলো একই ঘটনা। আল–াহ তা'য়ালা তার ওপর গযব নাযিল করলেন। মহান আল-াহ কারূন ও তার ঘরকে খেয়ে ফেলার জন্যে মাটিকে আদেশ দিলেন। ফলে কারূন ও তার ধন-সম্পদ ক্ষণিকের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেলো।

আল-াহ তা'য়ালা বলেন:

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ •

“ফলে আমরা তাকে (কারূনকে) তার ঘর-বাড়ি ও প্রাসাদ-অট্টালিকাসহ দাবিয়ে দিয়েছি মাটির নীচে। তখন তাকে আল-াহ্র পাকড়াওর বির–দ্ধে সাহায্য করার কেউই ছিলো না এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিলো না।”[২৬৮]

মহান আল–াহ আরো বলেন:

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ •

“কারূন, ফেরাউন ও হামান, এদের কাছে এসেছিল মূসা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে। তখন তারা দেশে হঠকারী শাসন চালাচ্ছিল। কিন্তু তারা (আমার শাস্ড়িকে) অতিক্রম করতে পারেনি।”[২৬৯]

কারূনের এ ধন সম্পদ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। অহংকারের কারণে আল-াহ তার সব সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তার সম্পদ ধ্বংসের অনেক কারণ ও কাহিনী রয়েছে। তার মধ্যে একটি কাহিনী ছিলো এরকম, অভিশপ্ত কারূন এক নারীকে বহু মাল দিয়ে এ কাজে উত্তেজিত করে যে, যখন মুসা (আ.) বনী ঈসরাইলের জামাতে দাড়িয়ে আল-াহর কিতাব পাঠ করতে শুর– করবেন ঠিক ঐ সময়ে যেন সে জনসম্মুখে বলে, হে মুসা, তুমি আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছো। কারূনের কথা মতো ঐ মহিলা তাই করলো। সে কারূনের শেখানো কথা বললো। তার এ কথা শুনে মুসা (আ.) কেঁপে উঠলেন এবং তৎক্ষনাত দু'রাকাত সালাত আদায় করে ঐ দিকে মুখ করে বললেন,

২৬৭. আল কুর'আন, ২৮:৭৮
২৬৮. আল কুর'আন, ২৮:৮১
২৬৯. আল কুর'আন, ২৯:৩৯

“আমি তোমাকে ঐ আল-াহর কসম দিচ্ছি, যিনি সমুদ্রের মাঝে রাস্ড়া নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, তোমার কাওমকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং বহু অনুগ্রহ করেছেন। তুমি সত্য ঘটনা খুলে বলো। মহিলাটি তখন বললো, হে মুসা (আ.), আপনি যখন আল-াহর কসমই দিলেন তখন আমি সত্য কথা বলছি। কারূন আমাকে বহু টাকা পয়সা দিয়েছে এই শর্তে যে, আমি যেন বলি আপনি আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছেন। আমিও আপনাকে তাই বলেছি। এজন্যে আমি আল-াহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার কাছে তওবা করছি। তার বক্তব্য শুনে মুসা (আ.) পুনরায় সেজদায় পড়ে যান এবং কারূনের শাস্ড়ি প্রার্থনা করেন। তখন আল-াহর নিকট হতে তার কাছে ওহী আসে, ‘আমি যমিনকে তোমার বাধ্য করে দিলাম।’ হযরত মুসা (আ.) তখন যমিনকে বললো, তুমি কারূন ও তার প্রাসাদকে গিলে ফেল। যমিন তাই করলো।[২৭০]

এভাবেই আল-াহর আদেশে মাটিতে জীবন্ড় প্রোথিত হয়ে যায় কারূন ও তার ধন-সম্পদ। সে তার ক্ষমতাবলে সম্পদ রক্ষা করতে পারেনি। আল-াহর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা তার ছিলো না।

কারূনের ধন-সম্পদ শেষ পর্যন্ড় আল-াহর কঠিন আযাব নিয়ে আসে। কারণ সে আল-াহর দেয়া এই নিয়ামতের সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি। আল-াহর দেয়া এ সম্পদ নিয়ে সে লোভী ও কৃপণের মতো আচরণ করেছে। অবশেষে তার ওপর আল-াহর আযাব এসে পড়লো। আর আল-াহ এমন এক মহান সত্তা যার কৌশল ব্যর্থ করে দেবার ক্ষমতা কারো নেই।

২৭০. আবদুল ওয়াদুদ, *কারূনের সম্পদ ধ্বংসের কাহিনী* (ইসলামি সাইটঃ www.watojannah.com, ০৮ এপ্রিল ২০১৪)

৯ম পরিচ্ছেদ

আসহাবে ফীলের ঘটনাঃ মহান আল-াহর অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন

রাসূল (সা.) -এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের সময়ে এক বিরাট ঘটনা ঘটে যায় যাকে পবিত্র কুর'আন চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। সেটি হচ্ছে, আসহাবে ফীল বা হাতিওয়ালাদের ঘটনা। তৎকালীন ইয়েমেনের শাসক ছিলেন আবরাহা আল হাবশী। তিনি যে হস্ত্মীবাহিনী নিয়ে বায়তুল-াহ শরীফের ওপর চড়াও হয়েছিলেন, তাদেরকে আসহাবে ফীল বলা হয়। বাহ্যত তারা ছিলো খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু ঈসা (আ.)-এর দ্বীনকে তারা বিকৃত করে ফেলেছিলো। তারা লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো মূর্তিপূজায়। তারা হস্ত্মী সংগে নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংস করার জন্যে অভিযান চালিয়েছিলো। কিন্তু কা'বা ঘরের অস্ত্মিত্ব মিটিয়ে দেয়ার আগেই আল-াহ তা'য়ালা তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিলো।

আসহাবে ফীলের ঘটনাটি ছিলো একটি বিরাট ঘটনা। সমগ্র আরবে এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। আরবের অনেক কবি এ নিয়ে কবিতা লিখেন। এ সমস্ত্ম কবিতার একক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সবখানেই একে আল-াহর অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোনো একটি কবিতাতেই ইশারা- ইংগিতে এ কথা বলা হয়নি যে, কা'বার অভ্যন্ত্মরে রক্ষিত যেসব মূর্তির পূজা করা হতো তাদের কারো এতে সামান্যতম হাত ছিলো।

যে বছর এ ঘটনাটি ঘটে, আরববাসীরা সে বছরটিকে 'আমুল ফীল' (হাতির বছর) বলে আখ্যায়িত করে। সে বছরই রাসূল (সা.) -এর জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে। এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক একমত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে, রাসূল সাল-াহু আলাইহি ওয়াসালাম -এর জন্ম হয় হাতির ঘটনার ৫০ দিন পরে। আবরাহার বাহিনীর অশুভ উদ্দেশ্য এবং তৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়া ছিলো মূলতঃ মহানবী (সা.) এর আগমনের পূর্বাভাস এবং তাঁর আগমনী সংবাদ।

আসহাবে ফীলের ঘটনার ঐতিহাসিক পটভূমি

ইয়েমেনের রাজত্ব যখন আবু কারব হাসসান ইবন্ তুব্বান আস'আদের হাতে। তাঁর পিতা তুব্বান আস'আদ আগে থেকেই পূর্ব দিক দিয়ে মদিনায় আসতেন এবং এভাবে মদিনা বাসীদেরকে বিব্রত না করেই সুকৌশলে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। সেখানে তিনি নিজের এক পুত্রকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিন্তু উক্ত পুত্র সহসা গুপ্ত ঘাতক কর্তৃক নিহত হয়। এরপর তুব্বান মদিনা ধ্বংস ও তার আধীবাসীদেরকে নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়ে আবার সেখানে আসেন। অতঃপর আমর ইব্ন তাল-ার নেতৃত্বে অনুগত লোকদের একটি দল সংঘবদ্ধ হয়। তারা শেষ পর্যন্ড় তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ দলটি এমন ভাব দেখায় যে, তারা যেন দিনের বেলায় তার সাথে যুদ্ধ করে ও রাত্রে আতিথেয়তা করে। তুব্বান তাদের এ আচরণে বিস্মিত হয়ে বলেন, আশ্চর্য! এই জাতি বাস্ড়বিক পক্ষেই ভদ্র ও সম্ভ্রান্ড়। এভাবে যুদ্ধ অব্যাহত থাকলো। এমতাবস্থায় একদিন দু'জন ইহুদি পন্ডিত মদিনা ও তার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তার ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তার কাছে আসেন। তারা তাকে বললেন, "হে রাজা, এ কাজটি করবেন না। আপনি যদি জিদ ধরেন, তাহলেও আপনার সামনে অপ্রতিরোধ্য বাধা আসবে। ফলে আপনি যা চান তা করতে পারবেন না। অথচ আপনি অচিরেই শাস্ড়ি ভোগ করবেন।" রাজা বললেন, "কি কারণে আমি শাস্ড়ি ভোগ করবো।?" মদিনা শেষ যামানার নবীর আশ্রয় স্থল। কুরইশদের দ্বারা তিনি পবিত্র স্থান থেকে বহিস্কৃত হবেন এবং এখানে এসে বসবাস করবেন। এ কথা শুনে রাজা নিবৃত্ত হলেন। তার মনে হলো লোক দুটো যথার্থই জ্ঞানী লোক। তাদের কথায় রাজা মুগ্ধ হলেন। তিনি মদিনা ত্যাগ করে ঐ পন্ডিতদ্বয়ের ধর্ম গ্রহণ করলেন। তুব্বা তথা তুব্বান আসআদ ও তার গোত্রের লোকেরা পৌত্তলিক ছিলেন। তিনি ইয়েমেনের পথে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। উসফান ও আমাজ নামক স্থান দ্বয়ের মধ্যস্থলে পৌঁছুলে হুযাইল ইব্ন মুদারাকা গোত্রের কতিপয় লোক তার কাছে বললো, "হে রাজা, আপনি কি এমন একটি অজানা ঘরের সন্ধান পেতে ইচ্ছুক, যা হীরক, মুণিমুক্তা, চুনিপান্না প্রভৃতি মুল্যবান সম্পদে পরিপূর্ণ, অথচ আপনার পূর্ববর্তী রাজারা সে ব্যাপারে অজ্ঞা ছিলো।" রাজা বললেন, "হ্যাঁ, এ রকম ঘরের সন্ধান অবশ্যই পেতে চাই।" তারা বললো, "মক্কাতে একটি ঘর আছে। মক্কাবাসীরা সেখানে ইবাদাত করে ও তার পাশে সালাত পড়ে।" আসলে বনী হুযাইলের লোকেরা তুব্বানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ পরামর্শ দিয়েছিলো। কেননা তারা জানতো, কাবাঘারকে করতলগত করার ইচ্ছা যে রাজাই করেছে এবং তার ওপর আক্রমণ যে-ই চালিয়েছে, সে-ই ধ্বংস হয়েছে। তুব্বানের ইচ্ছা হলো, বনী হুযাইলের পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন। কিন্তু তা করার আগে সেই ইহুদি পন্ডিতদ্বয়ের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের মতামত জানতে চাইলেন। পন্ডিতদ্বয় বললেন, "আপনাকে ও আপনার সৈন্য সামন্ড়কে ধ্বংস করাই বনী হুযাইলের ইচ্ছা। পৃথিবীতে আল-াহর কোনো ঘরকে আল-াহ ছাড়া অন্য কেউ নিজের মালিকানায় নিতে পেরেছে বলে আমাদের জানা নেই। তারা যে পরামর্শ দিয়েছে সে অনুসারে আপনি যদি কাজ করেন, তাহলে আপনার ও

আপনার সহচরদের সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হতে হবে। এটা অনিবার্য ও অবধারিত।” রাজা বললেন, “তাহলে আমি যখন ঐ ঘরের কাছে যাবো তখন আমার কি করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন?” তারা বললেন, “মক্কাবাসীরা যা করে আপনিও তাই করবেন। ঘরের চার পাশে তাওয়াফ করবেন এবং তার সম্মান ও তাজীম করবেন। তার কাছে থাকাকালে মাথার চুল কামিয়ে ফেলবেন। যতক্ষণ ঐ ঘরের কাছ থেকে বিদায় না হন ততক্ষণ অত্যন্ড় বিনয়াবনত থাকবেন।” রাজা বললেন, “আপনারা এসব করেন না কেন?” তারা বললেন, “খোদার কসম, ওটা আমাদের পিতা ইবরাহীমের বানানো ঘর। এই ঘর সম্পর্কে আপনাকে আমরা যা যা বলেছি সবই সত্য। তবে ঘরের চারপাশে বহু সংখ্যক মূর্তি স্থাপন করে মক্কাবাসী আমাদের ঐ ঘরের কাছে যাওয়ার পথ র্দ্ধ করে দিয়েছে। ঐ ঘরের কাছে রক্তপাত (নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও) চালু রেখেও তারা আমাদের যাওয়া বন্ধ করেছে। তারা অংশীবাদী ও অপবিত্র।” তুব্বান ইহুদি আলেম দ্বয়ের উপদেশ মেনে নিলেন এবং তা বাস্ড়বায়িত করলেন। এরপর হুযাইল গোত্রের সেই লোকদের কাছে গেলেন এবং তাদের হাত পা কেটে দিলেন। অতঃপর মক্কায় গিয়ে পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ করলেন, তার পাশে পশু জবাই করে কুরবানি আদায় করলেন এবং মাথার চুল কামালেন। এভাবে তিনি ছয়দিন মক্কায় কাটালেন। এই ছয়দিন পশু কুরবানি করে মক্কাবাসীকে খাওয়ানো এবং মধু পান করানোই ছিলো তাঁর প্রধান কাজ। তিনি স্বপ্নে দেখলেন কা’বা শরীফকে তিনি যেন গিলাফ দিয়ে আচ্ছাদিত করছেন। অতঃপর তিনি খাসাফ নামক মোটা কাপড় দিয়ে কাবায় গিলাফ চড়ালেন। তিনি আবার স্বপ্ন দেখলেন যে, আরো ভালো কাপড় দিয়ে কা’বাকে গিলাফ পরাচ্ছেন। সুতরাং পরে তিনি মূল্যবান ইয়েমেনি কাপড়ে কা’বাকে আবৃত করলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা এই তুব্বা তথা তুব্বানই প্রথম ব্যক্তি যিনি কা’বা শরীফকে গিলাফ পরিয়েছিলেন এবং কা’বার মুতাওয়াল-ী জুরহুম গোত্রের লোকদেরকে গিলাফ পরানোর অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম কা’বা ঘরকে পবিত্র করার (মূর্তি থেকে মুক্ত করা এর অন্ড়র্ভুক্ত ছিলো) নির্দেশ দেন, কা’বার ধারে কাছে যেন তারা রক্তপাত না ঘটায়, মৃতদেহ এবং ঋতুবর্তী মহিলাদের ব্যবহৃত ময়লা বস্ত্রখন্ড ফেলে না রাখে- এসব ব্যাপারে তিনি সবাইকে সাবধান করে দেন। তিনি কা’বা ঘরের জন্যে দরজা তৈরি ও তালাচাবির ব্যবস্থা করেন। এরপর তুব্বা মক্কা থেকে বেরিয়ে তার সৈন্যসামন্ড় ও ইহুদি পন্ডিতদ্বয়কে নিয়ে ইয়েমেন অভিমুখে যাত্রা করেন। ইয়েমেন পৌঁছে তিনি সেখানকার জনগণকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তার গৃহীত ধর্মমত গ্রহণের দাওয়াত দেন। ইয়েমেনবাসী সুস্পষ্টভাবে জানায়, তারা তাদের প্রথা মত আগুনের কাছে ফায়সালা চাওয়া ছাড়া ধর্ম ত্যাগ করবেনা। ইয়েমেনবাসীরা আগুনের মাধ্যমে ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করতো। ঐ আগুন অত্যাচারীকে গ্রাস করতো কিন্তু মযলুমের কোনো ক্ষতি করতো না। একদিন ইয়েমেনবাসী তাদের প্রতিমাসমূহ ও তাদের ধর্ম পালনের অন্যান্য সরঞ্জমাদি সহকারে এবং ইহুদি পন্ডিতদ্বয় তাদের আসমানি কিতাব কাঁধে ঝুলিয়ে যে স্থান দিয়ে আগুন বেরোয় সেখানে গিয়ে বসলো। আগুন বেরিয়ে প্রথমেই ইয়েমেন বাসীদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। ইয়েমেনবাসী তা দেখে ভীত

হয়ে পড়লো এবং আগুন থেকে দূরে সরে গেলো। উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে তিরস্কার করে ধৈর্যের সাথে যথাস্থানে বসে থাকতে বললো। তারা ধৈর্য ধারণ করে বসতেই আগুন তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললো এবং প্রতিমা ও অন্যান্য ধর্মীয় সাজ সরঞ্জাম বহন করছিলো তারাও ভস্মীভূত হলো। ফলে হিমইয়ার গোত্র তুব্বানের ধর্মে দীক্ষা নিলো। তখন থেকে ইয়েমেনে ইহুদি ধর্মের পত্তন হলো। তুব্বানের পর ইয়েমেনের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন তার ছেলে হাস্‌সান। তিনি সমগ্র ইয়েমেনবাসীকে সাথে নিয়ে সমগ্র আরব ও অনারব জগত দখল করার অভিপ্রায়ে এক বিজয় অভিযান শুর– করেন। এভাবে বাহরাইন ভূখন্ডে পৌঁছলে হিমইয়ার ও অন্যান্য ইয়েমেনী গোত্রগুলো তার সাথে আর সামনে এগুতে চাইলো না। তারা তাদের স্বদেশ ও পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ড় নিলো। তারা ঐ বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী হাস্‌সানের এক ভাই আমরের কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বললো, "তুমি তোমার ভাই হাস্‌সানকে হত্যা করো এবং আমাদের সাথে স্বদেশে ফিরে চলো। আমরা তোমাকেই রাজা হিসেবে বরণ করে নেবো।" আমর তার বাহিনীর লোকজনের সাথে আলোচনা করলে সবাই একমত হলো। কেবল যূর–আইন আল হিমইয়ারী এর বিরোধিতা করলো ও হত্যাকান্ড ঘটাতে নিষেধ করলো। কিন্তু আমর তার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করলো। তখন যূর–আইন নিুলিখিত কবিতা আবৃত্তি করলো, "হুশিয়ার! কে আছে নিজের নিদ্রার বিনিময়ে নিদ্রাহীনতাকে বরণ করে নেবে! যে ব্যক্তি তার সুখময় জীবনকে অব্যাহত রাখে সে-ই প্রকৃত ভাগ্যবান। কিন্তু হিমইয়ার বিশ্বাসঘাতকতা করলো তবে যূর–আইনের জন্যে খোদার স্বীকৃত ওজর রইলো।" এই কবিতাটুকু সে এক টুকরো কাগজে লিখে তাতে সীল মারলো। অতঃপর আমরের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, "আমার লেখা এই চিরকুটটুকু আপনার কাছে রেখে দিন। আমর সেটা রেখে দিলো।" অতঃপর সে তার ভাই হাস্‌সানকে হত্যা করলো এবং দলবল সাথে নিয়ে ইয়েমেনে প্রত্যাবর্তন করলো। আমর ইব্‌ন তুব্বান ফিরে আসার পর ঘোর অনিদ্রায় আক্রান্ড় হলো। রোগ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করলো তখন সে চিকিৎসক পাখীর সাহায্যে ভাগ্য গণনাকারী জোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের ডাকলো এবং তার রোগের রহস্য উদঘাটনে তাদের মতামত চাইলো। একজন বললো, "দেখুন, আপনি যেভাবে নিজের ভাইকে হত্যা করেছেন, এভানে আপন ভাই বা রক্ত-সম্পর্কীয় আপনজনকে যখনই কেউ হত্যা করেছে তাকে এ ধরনের নিদ্রাহীনতায় ভুগতে হয়েছে।" একথা শোনা মাত্রই আমর তার ভাই হাস্‌সানকে হত্যার পরামর্শ দানকারী ইয়েমেনের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিকে হত্যা করতে লাগলো। একে একে তাদের সবাইকে হত্যা করার পর যখন যূর–আইনের কাছে এলো তখন সে বললো, "আমার নির্দোষিতার প্রমাণ আপনার কাছেই রয়েছে।" আমর বললো, "সেটা কি?" যূর–আইন বললো, "আমার লিখিত এক টুকরো কাগজ যা আমি আপনাকে দিয়েছিলাম।" তখন আমর সেটা বের করে দেখলো তাতে দু'টা পংক্তি লেখা আছে। সে বুঝতে পারলো যে, যূর–আইন তাকে সদুপদেশই দিয়েছিলো। তাই সে তাকে হত্যা করলো না। এরপর আমর মারা গেলো। তার মৃত্যুর পর হিমইয়ারী শাসনের ক্ষেত্রে

অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দিলো এবং তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লো। এই সুযোগে তাদের ঘাড়ের উপর শাসক হয়ে চেপে বসলো লাখনিয়া ইয়ানূফ যূ-শানাতির নামক রাজ পরিবার বহির্ভূত এক ভয়ংকর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। সে তাদের সম্ভ্রান্ড় লোকজনদেরকে হত্যা করলো এবং রাজ পরিবারের লোকজনদের সাথে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হলো। লাখনিয়ার সবচেয়ে বড় পাপাচার ছিলো সমকাম। হাস্সানের ভাই এবং তুব্বানের ছেলে যূর'আ যূ-নাওয়াসকে একদিন সে এই অভিপ্রায়ে ডেকে পাঠালো। হাস্সান নিহত হওয়ার সময় যূর'আ ছিলো ছোট বালক। কিছু দিনের মধ্যে সে এক সুঠামদেহী ও বুদ্ধিমান তর"ণ যুবকে পরিণত হলো। যুর'আর কাছে লাখনিয়ার বার্তাবাহক এলে সে তার কু-মতলব বুঝতে পারলো। সে একখানা তীক্ষ্মধার হালকা ছুটি নিজের পায়ের তলায় জুতার ভেতর লুকিয়ে নিয়ে লাখনিয়ার কাছে গেলো। লাখনিয়া নিভৃতে ডেকে নিয়ে যুর'আর ওপর চড়াও হলো। সে সুযোগ বুঝে তৎক্ষণাৎ ছুরি দিয়ে তাকে প্রচন্ডভাবে আঘাত করলো। যুর'আ লাখনিয়াকে হত্যা করে জনসাধারণের সামনে সগর্বে নিজের কীর্তি প্রচার করতে লাগলো। এবার জনগণ বললো, "তুমি আমাদেরকে এ নরাধমের হাত থেকে নিস্কৃতি দিয়েছো। সুতরাং আমাদের শাসক হিসেবে তুমিই যোগ্যতম ব্যক্তি।" হিমইয়ার গোত্র ও সমগ্র ইয়েমেনবাসীর সহযোগিতায় যূর'আ যূনাওয়াস তাদের ওপর দীর্ঘস্থায়ী পরাক্রমশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করলো। যূর'আ ছিলেন হিমইয়ার বংশের সর্বশেষ সম্রাট এবং সে (কুরআনের সূরা বুরূজের) পরিখায় পুরে আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনার নায়ক। ইয়েমেনের নাজরান প্রদেশে হযরত ঈসা (আ.) এর প্রকৃত অনুসারীদের অবশিষ্ট একটি গোষ্ঠী তখনও বেঁচে ছিলো। তাঁরা ছিলেন জ্ঞানীগুণী ও সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী। তাঁদের নেতা ছিলেন আবদুল-াহ ইব্ন সামের। যূনাওয়াস তাদের বির"দ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে ইহুদিবাদ গ্রহণের দাওয়াত দিলো এবং পরিষ্কার বলে দিলো, "হয় ইহুদি হও, নচেৎ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।" সুতরাং তাদের জন্যে পরিখা খনন করা হলো। শেষ পর্যন্ড় তাদেরকে নির্মমভাবে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো এবং অনেককে তরবারি দিয়ে হত্যা করে তাদের লাশ বিকৃত করা হলো। এভাবে যূ-নাওয়াস প্রায় ২০ হাজার লোককে হত্যা করলো।[২৭১]

যূ-নাওয়াসের অগ্নিকুন্ডে নিহত মুমিনদের একজন কোনো রকমে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সাবা গোত্র উদ্ভূত দাওস যূসুলুবান নামক এই ব্যক্তি আগুনের পরিখা থেকে সুকৌশলে উদ্ধার পেয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে উর্ধ্বশ্বাসে মর"ভূমির ভেতর দিয়ে ছুটতে থাকেন। যূ-নাওয়াসের পশ্চাদ্ধাবনকারী লোকজনের চোখে ধূলো দিয়ে। ছুটতে ছুটতে তিনি রোমসম্রাটের দরবারে উপনীত হন। তিনি ইহুদিবাদী যূ-নাওয়াস ও তার সৈন্যসামন্ড়ের হাতে নাজরানবাসী মুমিনদের যে লোমহর্ষক গণহত্যা ও নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যু-নাওয়াসের শক্তির বির"দ্ধে রোমসম্রাটের সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট বলেন, "তোমার দেশ আমার এখান থেকে

---

২৭১. ইব্ন হিশাম, *সীরাতে ইব্ন হিশাম*, অনুবাদ: আকরাম ফার"ক (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০১) পৃ.-২১-২৫

অনেক দূরে অবস্থিত। তাই আমি আবিসিনিয়ার রাজাকে চিঠি লিখবো। তিনিও আমার ধর্মাবলম্বী। আর তাঁর দেশ তোমার দেশের কাছাকাছি।” সম্রাট আবিসিনিয়ার রাজাকে শুধু সাহায্য করার নির্দেশই নয়, সেই সাথে প্রতিশোধ গ্রহণেরও নির্দেশ দিয়ে চিঠি দিলেন। হাবশার রাজা নাজাশীর কাছে রোমান সম্রাটের ঐ চিঠি নিয়ে হাজির হলেন দাওস। নাজাশী হাবশা থেকে ৭০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দাওসের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। বাহিনীর সেনাপতি করা হলো আরিয়াত নামক এক ব্যক্তিকে। তার সহযোগি হিসেবে ঐ বাহিনীতে রইলো আবরাহা আল আশরাম নামক অপর এক ব্যক্তি। আরিয়াত তার সেনাবাহিনী নিয়ে সমুদ্র পথে ইয়েমেনের উপকূলে গিয়ে নামলেন। তার সাথে দাওস যূ-সুলুবানও ছিলেন। খবর পেয়ে যূ-নাওয়াস, হিমইয়ার ও তার অনুগামী অন্যান্য ইয়েমেনি গোত্র সমভিব্যাহারে আরিয়াতের সৈন্যদের বাধা দিতে এগিয়ে গেলেন। উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই হলো। অবশেষে যূনাওয়াস ও তার দলবল পরাজয় বরণ করলো। এই অবস্থা দেখে যূনাওয়াস তার ঘোড়াকে সমুদ্রের দিকে হাঁকালো। ঘোড়া সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং যূনাওয়াসের সলিল সমাধি ঘটলো। এখানেই যূনাওয়াস ও তার ইহুদিবাসী শাসনের অবসান ঘটলো। আরিয়াত ইয়েমেনে প্রবেশ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।[২৭২]

আরিয়াত দীর্ঘকাল ইয়েমেনের শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। এক সময় আবরাহা তাঁর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। তার দাবী ছিলো, নাজাশীর প্রতিনিধি হিসেবে ইয়েমেন শাসনের অধিকার তারই বেশী। হাবশী সৈন্যরা এই প্রশ্নে দ্বিধা-বিভক্তত হয়ে পড়লো। দুই দলে যুদ্ধ হবার উপক্রম হলে আবরাহা আরিয়াতকে এই মর্মে বার্তা পাঠালেন, “হাবশীরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে, পরিণামে কোনো লাভ হবে না। সুতরাং এসো, আমরা দু’জনে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হই। আমাদের দু’জনের মধ্যে যে জয়যুক্ত হবে, সমস্ড় সৈন্যবাহিনী তার আনুগত্য করবে।” আরিয়াত এই প্রস্ড়াবে রাজি হয়ে বললো, “হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো।” আরিয়াত ও আবরাহার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। আবরাহা অপেক্ষাকৃত ধার্মিক, মোটা ও বেঁটে এবং আরিয়াত লম্বা, সুদর্শন ও বিশালদেহী ছিলেন। তার হাতে ছিলো একটি অস্ত্র। আবরাহা তার পৃষ্ঠদেশকে রক্ষা করার জন্যে তার আতুদাহ নামক ক্রীতদাসকে পিছনের দিকে রাখলেন। আরিয়াত তার তরবারি দ্বারা আবরাহার মাথায় আঘাত করলে, কিন্তু তা তার মুখমন্ডলের ওপর লাগলো। এতে আবরাহার নাক ও কপালের ভ্রূ কেটে গেলো এবং ঠোঁট ও চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হলো। এ কারণেই তাকে আবরাহা আল-আশরাম বা নাক কাটা বলা হয়। এইবার আতুদাহ আবরাহার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে আরিয়াতকে আক্রমণ করে হত্যা

---

২৭২. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৬

করলো। এরপর আরিয়াতের অনুগত হাবশী সৈন্যরা আবরাহার দলে ভিড়ে যায় এবং আবরাহা আবিসিনিয়ার সর্বসম্মত প্রতিনিধিরূপে ইয়েমেন শাসন করতে থাকেন।[২৭৩]

আসহাবে ফীলের ঘটনা

হুমায়ের গোত্রের শেষ বাদশাহ যূনুয়াম, যে ছিলো মুশরিক। তার সময়ের মুসলিমদেরকে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলো। ঐ সব মুসলিম ছিলো হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্যিকার অনুসারী। তাঁদের সংখ্যা ছিলো প্রায় তিন হাজার। তাঁদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিলো। দাউস যু সা'লাবান নামক একটি মাত্র লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌঁছে রোমের বাদশাহ কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কায়সার ছিলেন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি হাবশীর (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজ্জাশীকে লিখলেন: "দাউস যু সা'লাবানের সংগে পুরো বাহিনী পাঠিয়ে দিন।" সেখান থেকে শত্রুদেশ নিকটবর্তী ছিলো। বাদশাহ নাজ্জাশী আমির ইবনে ইরবাত ও আবরাহা ইবনে সাহাব আবূ ইয়াকসুমকে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল ইয়েমেনে পৌঁছলো এবং ইয়েমেন ও তথাকার অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করলো। যুনুয়াস পালিয়ে গেলো এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করলো। যুনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ইয়েমেন হাবশীর বাদশাহর কর্তৃত্বে চলে গেলো। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়েমেনে বসবাস করতে লাগলো। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত উভয়ে নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে উভয় সর্দার পরস্পরকে বললো: "অযথা রক্তপাত করে কি লাভ, চলো আমরা উভয়ে লড়াই করি। যে বেঁচে যাবে, ইয়েমেন এবং সেনাবাহিনী তার অনুগত থাকবে।" এই কথা অনুযায়ী উভয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। আমির ইবনে ইরবাত আবরাহার উপর আক্রমণ করলো এবং তরবারির এক আঘাতে তার চেহারা রক্তাক্ত করে ফেললো। নাক, ঠোঁট এবং চেহারার বেশ কিছু অংশ কেটে গেলো। এ অবস্থা দেখে আবরাহার ক্রীতদাস আতূদাহ্ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইরবাতকে হত্যা করে ফেললো। মারাত্মকভাবে আহত আবরাহা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেলো। বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভালো হলো এবং সে ইয়েমেনের শাসনকর্তা হয়ে বসলো। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী এ খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং এক পত্রে জানালেন: "আল্লাহর কসম! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করবো এবং তোমার টিকি কেটে আনবো।" আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এই পত্রের জবাব লিখলো এবং দূতকে নানা প্রকারের উপঢৌকন, একটা থলের মধ্যে ইয়েমেনের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল কেটে ওর মধ্যে রাখলো ও ওর মুখ বন্ধ করে দিলো। তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখলো: "ইয়েমেন মাটি এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের কসম পূর্ণ করুন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে

২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭

দিন।" এতে নাজ্জাশী খুশি হলেন এবং ইয়েমেনের শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন।[২৭৪]

আবরাহা সানাতে কুল-াইস নামে এমন একটি গীর্জা তৈরি করে, তৎকালীন বিশ্বে যার সমতুল্য ও সদৃশ কোনো ঘর ছিলো না। অতঃপর সে নাজ্জাশীকে পত্র লিখলো, "হে রাজা, আমি আপনার জন্যে এমন একটা গীর্জা গড়েছি, যার তুলন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আরবদের হজ্জকে আমি এ গীর্জার এলাকায় স্থানান্ড়রিত না করা পর্যন্ড় ক্ষ্যন্ড় হবো না।" নাজ্জাশীর কাছে লেখা আবরাহার এ চিঠির কথা অচিরেই আরবদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলো। তারা ভীষণ ক্ষদ্ধ হলো। বনি কিনানা গোত্রে রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়ার মাসকে হালাল করণের প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী একটা গোষ্ঠী ছিলো। তাদের একজন রগচটা লোক গোপনে গিয়ে আবরাহার ঐ গীর্জায় পায়খানা করে রেখে আবার নিজের বস্ড়িতে ফিরে এলো। যথা সময়ে ব্যাপারটা আবরাহার কানে গেলো। সে লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, "এই কাজটা কে করলো?" লোকেরা জানালো, "জনৈক আরব একাজ করেছে। সে মক্কার কা'বাঘরে হজ্জ আদায়কারীদের দলভুক্ত। আপনি মক্কা থেকে এখানে হজ্জ স্থানান্ড়র ইচ্ছুক একথা শুনে সে রেগে গিয়ে এ কাজ করেছে। এ দ্বারা সে প্রমাণ করতে চায় যে, এ গীর্জা কা'বার বিকল্প হতে পারে না এবং এটা হজ্জের কেন্দ্র হবার যোগ্য নয়।" আবরাহা তো রেগেই আগুন। সে শপথ করলো যে, যেমন করেই হোক সে কা'বাকে ধ্বংস করবেই। হাবশীদেরকে সে তার অভিপ্রায় জানালো। হাবশীরা সব রকমের উপকরণ ও সরঞ্জাম দিয়ে তাকে প্রস্তুত হতে সাহায্য করলো। যথা সময়ে সে একদল হস্ড়ী নিয়ে কা'বা অভিযানে বেরিয়ে পড়লো। আল-াহর পবিত্র ঘর কা'বাকে আবরাহা ধ্বংস করতে চায় শুনে আরবরা উপলব্ধি করলো যে, এ হানাদারের বির"দ্ধে জিহাদ করা তাদের একান্ড় কর্তব্য।[২৭৫]

ইয়েমেনের জনৈক সম্ভ্রান্ড় ও প্রভাবশালী নাগরিক 'যূনফর' সমগ্র ইয়েমেনবাসী ও অন্যান্য আরবদেরকে আহ্বান জানালেন কা'বা শরীফকে রক্ষা করার জন্যে আবরাহার বির"দ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। যারা তার আহ্বানে সাড়া দিলো তাদের নিয়ে যূনফর আবরাহার বির"দ্ধে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু তিনি ও তার বাহিনী পরাজিত হলেন এবং যূনফর বন্দী হলেন। এরপর আবরাহা তার লক্ষ্যে এগিয়ে গেলো। খাস'য়াম উপজাতীয়দের এলাকায় পৌঁছুলে নুফাইল ইব্‌ন হাবিব আল্ খাসয়ামী দু'টি খাসয়ামী গোত্র শাহরান ও নাহিস এবং আরো কয়েকটি সমমনা আরব গোত্রকে সাথে নিয়ে আবরাহার বির"দ্ধে র"খে দাঁড়ালেন। যুদ্ধে নুফাইলও সদলবলে পরাজিত ও বন্দী হলেন। আবরাহা নুফাইলকে মুক্তি দিলে নুফাইল তার পথ প্রদর্শক হিসেবে সহযাত্রী হলেন। আবরাহা যখন তায়েফের উপর দিয়ে এগিয়ে চলছিলো, তখন সকিফ গোত্রের কিছু লোকজন সাথে নিয়ে মাসউদ ইব্‌ন মু'আততিব তার সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং

২৭৪. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবন্ কাসীর (র.), প্রাগুক্ত, খন্ড-১৮, পৃ.-২৭৬-২৭৭
২৭৫. ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭-২৮

তাকে বললো, “হে রাজা, আমরা একান্ড় অনুগত গোলাম তুল্য। আপনার বিরোধী নই আমরা। আপনি যে ঘর লক্ষ্য করে চলেছেন, ওটা আমাদের উপাসনার ঘর নয়। আপনিতো চাইছেন মক্কার ঘরে হামলা চালাতে। বেশ, আমরা আপনার পথ প্রদর্শক হিসেবে একজন লোক সংগে দিচ্ছি। সে আপনাকে দেখিয়ে দেবে কা'বা ঘর।” আবরাহা তাদের প্রতি প্রীত ও সদয় হলো। তায়েফবাসী তার সাথে আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে মক্কার পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে পাঠালো। আবরাহা ও তার দলবলকে সাথে নিয়ে মুগাম্মাস রিগালের কবরে পাথর নিক্ষেপ করতো এবং আজও মুগাম্মাসে তার কবরে লোকেরা পাথর নিক্ষেপ করে থাকে।[২৭৬]

আবরাহা মুগাম্মাসে যাত্রা বিরতি করার সময় আসওয়াদ ইব্ন মাকসুদ নামক জনৈক হাবশী নাগরিককে ঘোড়ায় চড়িয়ে মক্কা পরিদর্শনে পাঠায়। আসওয়াদ মক্কা পর্যন্ড় যায় এবং ফিরে আসার সময় উপত্যকায় চারণ ভূমিতে বিচরণশীল কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের গবাদি পশু ধরে নিয়ে আসে। এইসব গবাদি পশুর মধ্যে আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিমের দুশো উটও ছিলো। তিনি ঐ সময় কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ড় সম্মানিত ব্যক্তি ও বড় নেতা ছিলেন। গবাদি পশু ধরে নিয়ে আসার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ঐ এলাকার কুরাইশ, কিনানা ও হুযাইল গোত্র আবরাহার বির—দ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চেয়েছিলো। কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা বুঝতে পেরে তারা সে ইচ্ছা পরিহার করে। আবরাহাত হুনাতাহ আল্ হিমইয়ারীকে মক্কায় পাঠাবার সময় বলে দিলো, “প্রথমে মক্কার সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা যিনি, তাঁকে চিনে নিও। অতঃপর তাঁকে বলো, রাজা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি। এসেছেন শুধু কা'বা ঘরকে ধ্বংস করতে। তোমরা যদি আমাদেরকে এ কাজে বাধা দিতে কোনো যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হও তা হলে তোমাদের রক্তপাতের কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। তিনি যদি আমার সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্চুক না হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।”[২৭৭]

হুনাতাহ মক্কার প্রবেশ করে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো, মক্কায় সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা হলেন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম। সে আবদুল মুত্তালিবের কাছে উপস্থিত হলো এবং রাজা তাকে যা যা বলতে বলেছিলো তা বললো। আবদুল মুত্তালিব বললেন, “আল-াহর কসম! আমরা তার সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা এবং সে ক্ষমতাও আমাদের নেই। এটা আল-াহর পবিত্র ঘর এটা তাঁর নিজস্ব ঘর ও নিজস্ব সম্ভ্রমের ব্যাপার। আর যদি তিনি বাধা দেন তাহলে এটা তার নিজস্ব ঘর ও নিজস্ব সম্ভ্রমের ব্যাপর। আর যদি তিনি বাধা না দেন আমাদের কিছু করার থাকবে না।”[২৭৮]

তখন হুনাতাহ বললো, “আপনি আমার সাথে রাজার কাছে চলুন। কারণ তিনি আমাকে আদেশ করেছেন আপনাকে সংগে করে তার কাছে নিয়ে যেতে।” আবদুল

২৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৮-২৯
২৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৯
২৭৮. প্রাগুক্ত

মুত্তালিব তাঁর এক পুত্রকে সাথে নিয়ে আবরাহার নিকট চললেন। আবরাহার সৈন্যদের কাছে পৌঁছেই তিনি যূনফর সম্পর্কে খোঁজ নিলেন, যিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন। বন্দি যূনফরের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, "হে যূনফর, আমাদের উপর যে বিপদ নেমে এসেছে, তার প্রতিকারে তোমার দ্বারা কি কোনো সাহায্য হতে পারে?" যূনফর বললো, "এমন একজন রাজবন্দির কি-ইবা সাহায্য করার ক্ষমতা থাকতে পারে, যে প্রতিমূহুর্তে প্রহর গুণছে, এই বুঝি তাকে হত্যা করা হয়? বাস্ড়্বিকই তোমাদের এ মুসিবতে আমার তেমন কিছু করার নেই। তবে আনিস নামক একজন মাহুত আছে। সে আমার বন্ধু। তাকে আমি বার্তা পাঠাচ্ছি। তোমার উচ্চ মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে তাকে অবহিত করবো ও রাজার কাছে তুমি যাতে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারো সে জন্যে তাকে অনুমতি চেয়ে দিতে বলবো। এমনকি সম্ভব হলে সে যাতে তোমার ব্যাপারে সুপারিশও করে তাকে অনুরোধ করবো।" আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'এ টুকুই যথেষ্ট হবে।" এরপর যূনফর আনিসের নিকট এই বলে বার্তা পাঠালো, "শোনো! আবদুল মুত্তালিব হলেন কুরাইশদের একচ্ছত্র অধিপতি। মক্কার বণিক সমাজের নেতা। উপত্যকাভূমিতে মানুষের এবং পাহাড় পর্বতের বন্য পশুর খাদ্য সরবরাহকারী হিসেবে তিনি পরিচিত। সুতরাং তুমি রাজার সাথে সাক্ষাতের বন্দোবস্ড় করে দাও এবং যতোটা পারো তাঁর উপকার করো।" আনিস বললো, "ঠিক আছে। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।" আনিস আবরাহাকে বললো, "হে রাজা, কুরাইশদের নেতা আপনার দরবারে উপস্থিত। তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চান। তিনি মক্কায় বণিকদের দলপতি। তিনি উপত্যকা ভূমিতে যেমন মানুষের আহার করান তেমনি পর্বত শীর্ষের বন্যপশুর খাদ্য সরবরাহকারী বলেও সুখ্যাত। অনুগ্রহ পূর্বক তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে তাঁর দাবীদাওয়া পেশ করতে দিন।" আবরাহা তাঁকে অনুমতি দিলো।[২৭৯]

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সে সময়কার শ্রেষ্ঠতম সুদর্শন এবং অতি গণ্যমান্য ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আবরাহা তাঁকে দেখেই মুগ্ধ ও অভিভূত হলো। সে আবদুল মুত্তালিবকে এতোখানি সম্মানিত মনে করলো যে, নিজে উচ্চ আসনে বসে তাঁকে নীচে বসতে দিতে পারলো না। পক্ষান্ড়্রে হাবশীরা তাঁকে রাজার সাথে একই রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট দেখুক, তাও পছন্দ করলো না। অগত্যা আবরাহা স্বীয় রাজকীয় আসন থেকে নেমে নীচের বিছানায় বসলো এবং আবদুল মুত্তালিবকে সেখানে নিজের পাশে বসালো। অতঃপর দোভাষীকে বললো, "তাঁকে বক্তব্য পেশ করতে বলো।" দোভাষী আদেশ পালন করলো। আবদুল মুত্তালিব বললেন, "আমার অনুরোধ, আমার যে দুশো উট রাজার হাতে এসেছে, তা ফেরত দেয়া হোক।" দোভাষী যখন একথা আবরাহাকে জানালো তখন আবরাহা দোভাষীর মাধ্যমে বললো, "তোমাকে প্রথম দৃষ্টিতে যখন দেখেছিলাম তখন অভিভূত হয়েছিলাম কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে তোমার প্রতি

২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৯-৩০

আমার ভীষণ বীতশ্রদ্ধ জন্মে গেছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, তুমি আমার সাথে আমার হস্ড়গত দুশো উটের দাবী নিয়ে কথা বলছো। অথচ তোমার ও তোমার বাপদাদার ধর্মের কেন্দ্র যে কা'বাগৃহ, আমরা সেটাকে ধ্বংস করতে এসেছি এ কথা জেনেও তুমি সে সম্বন্ধে কিছুই বলছোনা।" আবদুল মুত্তালিব বললেন, "আমি শুধু উটেরই মালিক। কা'বা গৃহের মালিক আর একজন আছেন, তিনিই তাঁর ঘর রক্ষা করবেন।" আবরাহা বললো, "আমার আক্রমণ থেকে তিনি এ ঘরকে ঠেকাতে পারবেন না।" আবদুল মুত্তালিব বললেন, "সেটা আপনার আর কা'বা ঘরের মালিকের ব্যাপার।"[২৮০]

আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের উট ফিরিয়ে দিলো। আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে সমস্ড় ব্যাপারটা জানালেন। তিনি তাদেরকে মক্কা থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড় পর্বতের গোপন গুহা গুলোতে আশ্রয় নিয়ে আবরাহার সৈন্যদের সম্ভাব্য নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব নিজে কুরাইশদের একদল লোককে সাথে নিয়ে কা'বার দরজায় চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে দাঁড়ালেন এবং আল-াহর কাছে আবরাহা ও তার সৈন্য সামন্ড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তাঁর সাহায্য কামনা করে দোয়া করতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিব কা'বার চৌকাঠ ধরে বলতে লাগলেন।

"হে আল-াহ! একজন বান্দাও তার দলবলকে রক্ষা করে থাকে। অতএব তুমি তোমার অনুগত লোকদেরকে রক্ষা করো। ওদের ক্রুশ এবং বলবিক্রম যেন তোমার শক্তির উপর জয়যুক্ত না হয়। আমাদের কিবলাকে তুমি যদি ওদের কর—ণার ওপর ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ড় নিয়ে থাকো তাহলে যা খুশি করো।"

এরপর আবদুল মুত্তালিব কা'বার দরজায় চৌকাঠ ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ও তাঁর কুরাইশ সংগীরা পর্বত গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসে তারা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন আবরাহা মক্কায় ঢুকে কি করে।[২৮১]

পরদিন প্রত্যুষে আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তার হস্ড়ী বাহিনী ও সৈন্য বাহিনীকে সুসংহত করলো। তার হাতির নাম ছিলো মাহমুদ। আবরাহার সংকল্প ছিলো, প্রথমে কা'বাকে ধ্বংস করবে, অতঃপর ইয়েমেন ফিরে যাবে। হস্ড়ী বাহিনীকে মক্কা অভিমুখে পরিচালিত করলে নুফাইল ইব্‌ন হাবিব এগিয়ে এলো এবং আবরাহার হাতির পাশে দাঁড়ালো। অতঃপর সে হাতির কান ধরে বললো, "হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো। নচেত যেখান থেকে এসেছো ভালোয় ভালোয় সেখানে ফিরে যাও। জেনে রাখো তুমি আল-াহর পবিত্র নগরীতে রয়েছো।" অতঃপর তার কান ছেড়ে দিতেই হাতি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। এরপর অনেক মারধোর করেও হাতিকে ওঠানো সম্ভব হলো না। অতঃপর তার শুঁড়ের ভেতর আঁকা বাঁকা লাঠি ঢুকিয়ে রক্তাক্ত

---

২৮০. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩০-৩১

২৮১. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩১

করে দেয়া হলো যাতে হাতি ওঠে দাঁড়ায়। তবুও উঠলো না। অতঃপর তাকে পেছনের দিকে ইয়েমেন অভিমুখে ফিরতি যাত্রা করলে জোর কদমে চলতে লাগলো। অতঃপর যেই মক্কার দিকে চালিত করা হলো অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ঠিক এ সময়ে আল৷াহ তা'য়ালা সমুদ্রের দিক থেকে এক ধরনের কালো পাখী পাঠালেন। প্রতিটি পাখির সাথে তিনটে করে পাথরের নুড়ি ছিলো। একটা তার ঠোঁটে আর দুটো দুই পায়ে। পাথরগুলো কলাই ও বুটের মতো। যার গায়েই সেগুলো পড়তে লাগলো, সে-ই তৎক্ষণাৎ মরতে লাগলো। কিন্তু সবার গায়ে পড়তে পারলো না। অনেকেই পালিয়ে যেখান থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যেতে লাগলো। লোকেরা রাস্ত্মার যেখানে সেখানে পড়ে মরতে লাগলো। আবরাহার গায়ে একটা নুড়ি পড়তেই সে তৎক্ষণাৎ মারা গেলো।[২৮২]

মহান আল- াহর অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন

এক ঝাঁক পাখি যখন কালো মেঘের মতো সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসলো, চোখের পলকে ওগুলো আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়লো এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দুই পায়ে দু'টি কংকর ছিলো। কংকরের ঐটুকরোগুলো ছিলো মসুরের ডাল বা মাস কলাই এর সমান। পাখিগুলো কংকরের ঐ টুকরোগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিলো। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিলো সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিলো।[২৮৩]

ওয়াকেদী (র.) বলেন যে, পাখিগুলো ছিলো সবুজ রঙের। এগুলো কবুতরের চেয়ে কিছু ছোট ছিলো। ওদের পায়ের রঙ ছিলো লাল। অন্য এক রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, মাহমুদ নামক হাতীটি যখন বসে পড়লো এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে পাঠানো সম্ভব হলো না। তখন সৈন্যরা অন্য একটি হাতীকে সামনের দিকে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে পা বাড়াতেই তার মাথায় কংকরের টুকরো পড়লো এবং আর্তনাদ করে পিছনে সরে এলো। অন্যান্য হাতীও তখন এলোপাতাড়ি ছুটতে শুর“ করলো। কয়েকটির উপর কংকর পড়ায় তৎক্ষণাৎ ওগুলো মারা গেলো। যারা ছুটে পালাচ্ছিলো তাদেরও এক একটি অংগ খসে খসে পড়ছিলো। অবশেষে সবগুলোই মারা গেলো। আবরাহা বাদশাহও ছুটে পালালো, কিন্তু তারও এক একটি অংগ খসে পড়েছিলো। সানআ (তৎকালীন ইয়েমেনের রাজধানী) নামক শহরে পৌঁছার পর সে মাংসপি– পরিণত হলো এবং কুকুরের মতো ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করলো। তার কলেজা ফেটে গিয়েছিলো। কুরায়েশরা প্রচুর ধন সম্পদ পেয়ে গিয়েছিলো। ঐ বছরই সারা দেশে প্রথম ওলা ওঠা এবং পে- গ রোগ দেখা দেয়। হরযল, হানযাল প্রভৃতি কটুগাছও ঐ বছর উৎপন্ন হয়।[২৮৪]

---

২৮২. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১-৩২

২৮৩. তাফহীমুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খন্ড-১৮, পৃ.-২৮০

২৮৪. প্রাগুক্ত

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন যে, ঐ পাখিগুলোর চঞ্চু ছিলো পাখির মতো এবং নখ ছিলো কুকুরের মতো। ইকরিমাহ (র.) বলেন যে, সবুজ রংয়ের এই পাখিগুলো সমুদ্র হতে বের হয়ে এসেছিলো। ওগুলোর মাথা ছিলো জন্তুর মতো। যার মাথায় ঐ কংকর পড়ছিলো তা তার পায়খানার দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। একই সাথে ঐ ব্যক্তি দ্বিখণ্ডিত হয়ে লুটিয়ে পড়ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রবল বাতাস বইতে লাগলো। এর ফলে আশে পাশের বালুকণা এসে তাদের চোখে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে ঘায়েল করে ফেললো। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তছনছ করে দিলেন এবং সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন। তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কোনো কল্যাণই তারা লাভ করতে সামর্থ হলো না। তাদের দুরাবস্থার খবর অন্যদেরকে পৌঁছানোর মতো কেউই তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না। অল্পসংখ্যক যারা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বেঁচেছিলো তারাও পরে ধুকে ধুকে মরেছিলো। স্বয়ং বাদশাহ্ও এক টুকরা গোশতের মতো হয়ে গিয়েছিলো। কোনক্রমে সে সানআতে পৌঁছলো। সেখানে পৌঁছেই তার কলেজা ফেটে গেলো এবং সে মারা গেলো। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকসূ ইয়েমেনের শাসন ভার গ্রহণ করলো। তারপর তার অন্য ভাই মাসরূক ইব্‌ন আবরাহা সিংহাসনে আরোহন করলো। এ সময়ে যূইয়াযান হুমাইরী কিসরার (পারস্য সম্রাট) কাছে গিয়ে হাবশীদের কবল থেকে ইয়েমেনকে মুক্ত করার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করলো। কিসরা সাইফের সাথে একদল বাহাদুর সৈন্য পাঠালো। সেই সৈন্যদল হাবশীদেরকে পরাজিত করে আবরাহার বংশধরদের কবল থেকে ইয়েমেনের শাসনক্ষমতা কেড়ে নেয়। অতঃপর হুমাইরীয় গোত্র ইয়েমেন শাসন করতে থাকে। আরবের লোকেরা এ উপলক্ষে উৎসব পালন করে। চারদিক থেকে হুমাইরীয় গোত্রের বাদশাহকে অভিনন্দন জানানো হয়।[২৮৫]

হযরত আয়েশা বিনতে আবী বকর (রা.) বলেন: "আবরাহার সৈন্যদলের দু'জন সৈন্যকে আমি মক্কা শরীফে দেখেছি। তারা উভয়েই অন্ধ এবং চলাচল অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। তারা বসে বসে ভিক্ষা করতো।"[২৮৬]

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরাইশদের সম্মান বৃদ্ধি পায় ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে চরম প্রভাব ফেলে। হাবশীরা যখন আযাবে পতিত হয় ও ধ্বংস হয় এবং আল্লাহ মক্কাকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন তখন আরবরা কুরাইশদের সম্মান করে ও বলে, আল্লাহ তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন।

অনুরূপভাবে এ ঘটনায় আরবদের মাঝে আবদুল মুত্তালিবের নাম, সম্মান ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং নিজ কাওমকে বড় বিপদ ও ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন।[২৮৭]

---

২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৮২

২৮৬. প্রাগুক্ত, খন্ড-১৮, পৃ.-২৮০-২৮৩

২৮৭. *আসহাবে ফীল (হাতি ওয়ালা) ঘটনা*, www.islamerpath.com

সমগ্র আরববাসী স্বীকার করতো আবরাহার এ আক্রমণ থেকে কোনো দেবতা বা দেবী নয় বরং আল্লাহ কা'বার হেফাযত করেছেন। কুরাইশ সর্দাররা আল-াহর কাছে সাহায্যের জন্যে দোয়া করেছিলো। আবার এ ঘটনা কুরাইশদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ড় এতো বেশি প্রভাবিত করে রেখেছিলো যে, তারা সে সময় একমাত্র আল-াহর ছাড়া আর কারোর ইবাদত করেনি।

মক্কা বিজয়ের ভাষণে রাসূল (সা.) হস্তিবাহিনী ধ্বংসের কথা উলে-খ করে বলেন-

"নিশ্চয়ই আল-াহ মক্কা থেকে হস্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করেছেন এবং তার ওপর তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে বিজয়ী করেছেন। আর এর পবিত্রতা পুনরায় আজ ফিরে এসেছে, যেমন পবিত্র ছিলো গতকাল। অতএব হে জনগণ। উপস্থিতগণ অনুপস্থিতগণের নিকট পৌঁছে দাও।[২৮৮]

আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (সা.) কে নবী হিসেবে পাঠানোর পর এ ঘটনাকে কুরাইশদের প্রতি তাঁর বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ হিসেবে উলে-খ করেন। কেননা এর মাধ্যমেই তিনি হাবশীদের পরাধীনতার বিপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন। যাতে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য বহাল থাকে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফীলে বলেন-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ • أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ • وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ • تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ • فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ •

"তুমি কি দেখোনি (হে মুহাম্মদ!) তোমার রব হাতীওয়ালা বাহিনীর সাথে কী আচরণ করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ড় ব্যর্থ করে দেননি? তিনি তাদের উপর পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। তারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল। এভাবে তিনি তাদের করে দিয়েছিলেন চিবানো ভূষির মতো।"[২৮৯]

আসহাবে ফীলের এ ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়, হকের দা'ওয়াত যদি কেউ বল প্রয়োগ করে দমন করতে চায়, তাহলে যে আল-াহ আসহাবে ফীলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো তারা তাঁরই ক্রোধের শিকার হবে।

---

২৮৮. ইমাম বুখারি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৮৮০

২৮৯. আল কুর'আন, ১০৫:১-৫

১০ম পরিচ্ছেদ

আহলে মাদইয়ান ও আসহাবে আয়কাহ

তাফসীরকারদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, আহলে মাদইয়ান ও আসহাবে আয়কাহ কি দুটি পৃথক জাতি, না একই জাতির দুটি পৃথক পৃথক নাম। একদলের অভিমত এই যে, এ দুটি আলাদা আলাদা জাতি এবং তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সূরায়ে আ'রাফে হযরত শুয়াইব (আ.)-কে আহলে মাদইয়ানের ভাই বলা হয়েছে (وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا) এবং এখানে আসহাবে আয়কাহ-এর উলে�খ প্রসংগে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে (اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ) যখন শুয়াইব (আ.) তাদেরকে বললেন। তাদের ভাই কথাটি ব্যবহার করা হয়নি। পক্ষান্ড়রে কতিপয় তফসিরকার উভয়কে একই জাতি বলে অভিহিত করেন। কারণ সূরা আ'রাফে এবং হুদে আসহাবে মাদইয়ানের যে সব দোষত্র"টি ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাই এখানে আসহাবে আয়কাহ-এর বেলায়ও বলা হচ্ছে। হযরত শুয়াইব (আ.) এর দা'ওয়াত ও নসিহত একই ধরনের এবং অবশেষে তাদের পরিণামেও কোনো পার্থক্য নেই।[২৯০]

ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান

তত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায় যে উভয় উক্তিই ঠিক। আসহাবে মাদইয়ান এবং আসহাবে আয়কাহ নিঃসন্দেহে দুটি পৃথক গোত্র। কিন্তু একই বংশের দুটি পৃথক শাখা। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সন্ড়ানদের মধ্যে যাঁরা তাঁর দাসী কতুরাগ গর্ভজাত ছিলেন, তারা আরব ও ইসরাঈলী ইতিহাসে বনী কাতুরা নামে অভিহিত হন। তাদের মধ্যে একটি অতি প্রসিদ্ধ গোত্র মাদইয়ান ইব্‌ন ইবরাহীমের বংশোদ্ভূত বিধায় মিদইয়ানী অথবা আসহাবে মাদইয়ান বলে অভিহিত হয়। তাদের জনসংখ্যা উত্তর হেজায থেকে ফিলিস্ড়িনের দক্ষিণাংশ পর্যন্ড় এবং সেখান থেকে সিনাই উপত্যকার শেষাংশ পর্যন্ড় আকাবা উপসাগর ও লোহিত সাগরের তটভূমির উপরে ছড়িয়ে পড়ে। মাদইয়ান শহর ছিলো তাদের প্রধান কেন্দ্রস্থল এবং আবুল ফেদার মতে তা অবস্থিত ছিলো, আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তার আয়লা (বর্তমান আকাবা) থেকে পাঁচদিনের পথে। বনী কাতুরার বাকী অংশ উত্তর আরবে তাইমা, তাবুক এবং আল্‌উলার মধ্যবর্তীস্থানে বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে বনী দেদান অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন ছিলো। তবুক ছিলো তাদের প্রধান কেন্দ্রস্থল যাকে প্রাচীনকালে আয়কাহ বলা হতো।[২৯১]

---

২৯০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৭
২৯১. প্রাগুক্ত

উভয় গোত্রের জন্যে একই নবী কেন?

আসহাবে মাদইয়ান এবং আসহাবে আয়কার জন্যে একই নবী প্রেরণের কারণ সম্ভবতঃ এই ছিলো যে, উভয়ে একই বংশোদ্ভূত ছিলো। তারা একই ভাষায় কথা বলতো এবং তাদের বসবাসের অঞ্চলগুলি পরস্পর মিলিত ছিলো। এটাও হতে পারে যে, কোনো কোনো অঞ্চলে তারা একত্রেই বসবাস করতো এবং বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে তারা একই সমাজভূক্ত হয়ে পড়েছিলো। উপরন্তু বনী কাতুরার এসব শাখার লোকদের পেশা ছিলো ব্যবসা এবং উভয়ের মধ্যে একই ধরনের দূর্নীতি বিদ্যমান ছিলো তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে। একই ধরনের ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যাধিও তাদের মধ্যে ছিলো। বাইবেলের আদি পুস্ড়কগুলির স্থানে স্থানে উলে-খ আছে যে, "তারা 'ব'লে ফাভরের' পূজা করতো এবং বনী ইসরাইল যখন মিসর থেকে বের হয়ে তাদের অঞ্চলে এলো তখন এদের মধ্যেও তারা শিরক ও ব্যাভিচারের মহামারী ছড়িয়ে দেয়।"[২৯২]

আন্ডর্জাতিক ব্যবসায়ের দুটি বড়ো রাজপথে তাদের বসতি ছিলো। এ দুটি পথে চলে গিয়েছে ইয়েমেন থেকে সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগর থেকে মিসর পর্যন্ড় এ দুটি রাজপথের উপরে অবস্থিত হওয়ার কারণে তারা ব্যাপক আকারে রাহাজানি ও লুটতরাজ করতো। ভিন্ন জাতির ব্যবসায়ী কাফেলাগুলির নিকট থেকে মোটা অংকের খাজনা না নিয়ে যেতে দিতো না। আন্ডর্জাতিক ব্যবসার উপরে নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে তারা এ দুটি পথে নিরাপত্তা বিপন্ন করে রেখেছিলো।[২৯৩]

তাদের রাহাজানির উলে-খ সূরা আ'রাফে এভাবে উলে-খ করা হয়েছে:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ •

"যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে তোমরা পথে পথে বসে থেকোনা, তাদেরকে আল-াহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করোনা এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করোনা। স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে গুটি কয়েক, তারপর আল-াহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। আরো লক্ষ্য করে দেখো, অতীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কী পরিণতি হয়েছিল?"[২৯৪]

এ সব কারণেই আল-াহ তা'য়ালা এই দু' গোত্রের জন্যে একই নবী পাঠান এবং তাদেরকে একই ধরনের শিক্ষাদান করেন।

মাদইয়ানবাসীদের পরিচয়

---

২৯২. গণনা পুস্ড়ক, অধ্যায় ২৫, স্ড়োত্র ০১-০৫

২৯৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ.-১২৫

২৯৪. আল কুরআন, ০৭:৮৬

মাদইয়ানের প্রকৃত আবাসস্থল হেজাযের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর এবং আকাবা উপসাগরের তটভূমিতে অবস্থিত ছিলো, যদিও সিনাই উপত্যকার পূর্বে তীরেও তাদের কিছু বসতি ছড়িয়ে ছিলো। তারা ছিলো একটি ব্যবসায়ী জাতি। প্রাচীনকালে যে বাণিজ্যিক রাজপথ লোহিত সাগরের তীরে তীরে ইয়েমেন থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত যেতো এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক রাজপথ ইরাক থেকে মিসর যেতো, এ দুটি রাজপথের মোহনায় এই জাতির বসতি ছিলো। এর ভিত্তিতেই আরবের আবাল-বৃদ্ধবণিতা তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলো। তারা নির্মূল হওয়ার পরও তাদের খ্যাতি অক্ষুণ্ন ছিলো। কারণ আরববাসীদের বাণিজ্য কাফেলা মিসর ও সিরিয়া যাবার পথে রাতদিন তাদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করে যেতো।

মাদইয়াবাসীদের সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা যা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে তা হলো এই যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তৃতীয় বিবি কাতুরার গর্ভজাত পুত্র মিদইয়ানের বংশধর ছিলো। প্রাচীনকালের প্রথা অনুযায়ী যারা কোনো মহান লোকের সাথে বংশীয় সম্পর্ক রাখতো তাদেরকে বনী অমকু বলা হতো। এ প্রথা অনুযায়ী আরবের অধিক সংখ্যক অধিবাসীকে বনী ইসরাইল বলা হতো। হযরত ইয়াকুব (আ.) -এর সন্তানদের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী সকলে বনী ইসরাইল নামে অভিহিত হয়। এভাবে মাদইয়ান অঞ্চলের সকল অধিবাসী যারা মিদইয়ান ইব্‌ন ইবরাহীম (আ.) -এর প্রভাবাধীন ছিলো বনী মিদইয়ান নামে অভিহিত এবং তাদের দেশের নাম মাদইয়ান অথবা মিদইয়ান হয়ে পড়ে।

এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানার পর এ ধারণা করার কোনোই কারণ থাকতে পারে না যে এই জাতিকে দীনে হকের দা'ওয়াত সর্ব প্রথম হযরত শুয়াইব (আ.) দিয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বনী ইসরাইলের মতো সূচনাতে তারাও মুসলিম ছিলো এবং হযরত শুয়াইব (আ.) -এর আবির্ভাবের সময় তাদের অবস্থা ছিলো একটা অধঃপতিত জাতির ন্যায়, যেমনঃ হযরত মূসা (আ.) -এর আবির্ভাবের সময় বনী ইসরাইলের অবস্থা ছিলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর পর ছ'সাতশ বছর পর্যন্ত মুশরিক ও চরিত্রহীন জাতির মধ্যে বসবাস করতে করতে তারা শিরকের রোগে আক্রান্ত হয় এবং চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত হয়। এর পরেও ঈমানের দাবী ও তার উপর তাদের গর্ব অক্ষুণ্ন ছিলো।[২৯৫]

২৯৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৯-৬১

সংস্কার সংশোধনের আহ্বানের প্রতিক্রিয়া

মাদইয়ান বাসীদের প্রতি হযরত শুয়াইব (আ.) সংশোধনের আহ্বান জানালেন।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ •

"আর মাদইয়ানের অধিবাসীদের কাছে আমরা পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শুয়াইবকে। সে তাদের বলেছিল: হে আমার কওম! তোমরা এক আল-াহ্র ইবাদত করো, তোমাদের জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, অতএব মাপ ও ওজন ঠিকঠিকভাবে পূর্ণ করে দেবে। মানুষকে তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দেবেনা এবং শান্ড়ি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশে ফাসাদ (বিশৃংখলা) সৃষ্টি করবেনা। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণের পথ যদি তোমরা মুমিন হও।"[২৯৬]

আর এর জবাবে কাওমের কাফির নেতারা বলেছিল:

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ •

"তার কাওমের কাফির নেতারা (জনগণকে) বলেছিল: 'তোমরা যদি শুয়াইবের অনুসরণ করো, তবে অবশ্যি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে।"[২৯৭]

হযরত শুয়াইব (আ.) সংস্কার সংশোধনের যে দা'ওয়াত পেশ করেছিলেন তার জবাবে মাদইয়ানের সর্দার ও নেতাগণ বলতো এবং জাতিকে এ কথার নিশ্চয়তা দান করতো, শুয়াইব (আ.) যে ধরনের ঈমানদারি ও সততার দা'ওয়াত দিচ্ছেন এবং চরিত্র ও বিশ্বস্ড়তার যে শাশ্বত নীতি মেনে চলতে বলছেন তা যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে চলবে যদি আমরা সততার অনুসরণ করি ও খাঁটিভাবে কেনা বেচা করি? আমরা দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ব্যবসার রাজপথের মোহনায় বাস করি এবং মিসর ও ইরাকের মতো দুটি বিরাট সভ্যতামন্ডিত রাজ্যের সীমান্ড়ে অবস্থান করি। যদি আমরা বাণিজ্য কাফেলাগুলিকে

---

২৯৬. আল কুরআন, ০৭:৯০

২৯৭. আল কুরআন, ০৭:৯০

বেকায়দায় ফেলা বন্ধ করে দেই এবং নিজেরা ভালো মানুষের মতো শাস্তি প্রিয় হয়ে যাই তাহলে বর্তমান ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আমরা যে সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করছি তা সব বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর পার্শ্ববর্তী জাতিগুলির উপর আমাদের যে প্রতিপত্তি রয়েছে তাও থাকবে না।[২৯৮]

এ কথা ও দৃষ্টিভংগি শুধু শুয়াইব জাতির সর্দারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। প্রত্যেক যুগেই পথভ্রষ্ট লোকেরা হক, সততা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে এ ধরনেরই আশংকা অনুভব করেছে। প্রত্যেক যুগের দুস্কৃতিকারীগণের এ ধারণাই ছিলো যে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অন্যান্য দুনিয়াবী ও বৈষয়িক কর্মকান্ড বেঈমানী ও দূর্নীতি ব্যতীত চলতে পারে না। প্রত্যেক স্থানেই দা'ওয়াতে হকের মুকাবিলায় যে ওজর আপত্তি পেশ করা হয়েছে সে সবের মধ্যে এও একটি যে দুনিয়ার প্রচলিত পথ ও পন্থা থেকে সরে গিয়ে যদি দা'ওয়াতে হকের অনুসরণ করা হয় তাহলে জাতির ধ্বংস হয়ে যাবে।[২৯৯]

মাদইয়ানবাসীদের উপর আযাব

মাদইয়ানবাসীর উপর ভয়ানক বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্পের আকারে শাস্তি নেমে এসেছিলো।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ •

"অতএব তাদের পাকড়াও করে এক প্রচন্ড ভূমিকম্প। ফলে তাদের সকাল হয় নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায়।"[৩০০]

তাদের এ ধ্বংসলীলা দীর্ঘকাল ধরে পার্শ্ববতী জাতিসমূহের জন্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলো। যবুর গ্রন্থের এক স্থানে আছে, হে খোদা, অমুক অমুক জাতি তোমার বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ করেছে। অতএব তুমি তাদের সাথে সে আচরণ-ই করো যা তুমি মাদইয়ানের সাথে করেছো।

ইয়াহইয়া নবী এক স্থানে ইসরাইলীদেরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, আশিরিয়দেরকে ভয় করো না। যদিও তারা তোমাদের জন্যে মিসরীদের মতোই জালেম হয়ে পড়ছে, কিন্তু সত্বরই সকল সৈন্যের রব তাদের উপর তাঁর চাবুক মারবেন এবং তাদের পরিণতি তাই হবে যা হয়েছিলো মাদইয়ানদের। (ইয়াসইয়া ১০:২১-২৬)[৩০১]

আয়কাবাসীদের উপর আযাব

---

২৯৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৬৪
২৯৯. প্রাগুক্ত
৩০০. আল কুরআন, ০৭:৯১
৩০১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৬৪

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ •

“এভাবে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব তাদের গ্রাস করে নেয়। সেটা ছিলো এক গুরুতর দিনের আযাব।”[৩০২]

তাদের উপর যে আযাব নাযিল হয়েছিলো তার কোনো বিবরণ কুরআনে অথবা সহীহ হাদিসে পাওয়া যায় না। বাহ্যিক শব্দগুলি থেকে যা বুঝতে পারা যায় তা হলো এই যে, যেহেতু তারা আসমানি আযাব চেয়েছিলো, সে জন্যে আল-াহ তা'য়ালা তাদের উপরে একটি মেঘ পাঠিয়ে দেন যে তাদের উপর ছাতার মতো ছায়া দান করতে থাকে যতোক্ষণ না আযাব তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। কুরআন থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যায় যে মাদইয়ানবাসীদের আযাবের ধরন আয়কাহ্‌বাসীদের আযাব থেকে আলাদা ছিলো। যেমন এখানে বলা হয়েছে যে ছাতাওয়ালা আযাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করা হয় এবং তাদের উপর আযাব এসেছিলো বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্পের আকারে। এজন্যে এই দুটিকে মিলিয়ে একটি কাহিনী রচনা করার প্রচেষ্টা সঠিক নয়।

৩০২. আল কুরআন, ২৬:১৮৯

উপসংহার

মানবের হৃদয়ে একটি Rational Mind বা যৌক্তিক মন রয়েছে। তার যুক্তিবাদী মন প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। সর্বশক্তিমান আল-াহ মানুষের স্রষ্টা। তিনি মানব মনের প্রকৃতি জানেন বলেই নিজের অস্ড়িত্বে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে মানুষের সামনে অসংখ্য ঘটনাবলী পেশ করে তাঁর শক্তিমত্তা, বিশালতা, বিরাটত্ব, অলৌকিক ক্ষমতাকে মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল করার ব্যবস্থা করেছেন। স্থাপন করে রেখেছেন অগণিত নিদর্শন।

যারা সত্য পথ খুঁজে পেতে চায়, তাদের জন্যে আল-াহর যমিনে শুধু নিদর্শন আর নিদর্শনই ছড়িয়ে আছে। এসব দেখে তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু যারা হঠকারী কোনো নিদর্শনই তাদের মধ্যে প্রভাব ফেলে না। অতীতের হঠকারী লোকেরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা আল-াহর নিদর্শনাবলী এবং নবীদের অলৌকিক কাজকর্ম দেখার পরও ঈমান আনেনি। অবশেষে তারা আল-াহর অনিবার্য ধ্বংসের কবলে পড়ে।

এ গবেষণায় উদঘাটিত হয়েছে যে, মহান আল-াহ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে অন্ধকার অরণ্যে ছেড়ে দেননি। বরং মানুষের জীবনকে সুন্দর, সুশীল ও সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে তিনি যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তিনি মানুষকে সুন্দর সফল জীবন-যাপনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

কুর'আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও দুনিয়ায় বিদ্যমান নিদর্শনাবলীর মধ্যে এমন একটি নিশানী রয়েছে যে, এ সম্পর্কে চিন্ড়া-ভাবনা করলে মানুষের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, আখেরাতের আযাব অবশ্যিই আসবে এবং এ সম্পর্কিত নবীদের দেয়া খবর সত্য। তাছাড়া এ নিশানী থেকে আল-াহর আযাবের কঠোরতা ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়। ফলে এ জ্ঞান মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। এ ভীতি তাকে সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

কুর'আন গবেষণার ফলে একথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যাঁরাই নবী রাসূলের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের অনুসরণ করে জীবন যাপন করেছেন তাঁরা যুগে যুগে আল-াহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের জীবনাদর্শ অনন্ড়কাল ধরে বিশ্ববাসীর কাছে অনুসরণীয় ও প্রেরণাদায়ক হয়ে থাকবে।

কুর'আনের ওপর ঐতিহাসিক অধ্যয়ন থেকে আরো জানা যায় যারাই আল-াহর নিযুক্ত নবী রাসূলগণের বির"দ্ধাচরণ করেছে তাদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের

বির‍ুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র করেছে সর্বকালেই তারা এবং তাদের বস্তুবাদী বিলাসী জীবন উপকরণসমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

কিয়ামত পর্যন্ড় বিশ্ববাসী তাদের ধ্বংসের ইতিহাস এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন সমূহ থেকে নিজেদের মুক্তির দিশা লাভ করতে পারে।

মানব জাতির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে ধারাবাহিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে জাতি, সম্প্রদায় ও দলের উত্থান ও পতন ঘটেছে এবং এ উত্থান ও পতনে সুস্পষ্টভাবে কিছু নৈতিক কার্যকরণ সক্রিয় ছিলো। পতনশীল জাতিগুলোর পতনের ইতিহাস অকাট্য এ সত্যের ইংগিত দেয় যে- মানুষ এ বিশ্ব জাহানে এমন একটি রাষ্ট্রশক্তির অধীন, সে শক্তির একটি ন্যায়সংগত নৈতিক বিধান আছে। এ বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে সে নৈতিকতার একটি বিশেষ সীমানার ওপরে অবস্থানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে এবং যারা এ সীমানার অনেক নিচে নেমে যায় তখন তারা এমনভাবে ধ্বংস হয় যা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে একটি শিক্ষণীয় ইতিহাস হয়ে থাকে। একটি ধারাবাহিক বিন্যাস সহ সব সময় এ ঘটনাবলীর প্রকাশ হতে থাকার ফলে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না যে, পুরস্কার ও শাস্ড়ি এবং প্রতিদান ও প্রতিবিধান এ বিশ্ব-জাহানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্থায়ী আইন।

বিভিন্ন জাতির ওপর আসা আযাবগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনুমান করা যায় যে, আইনের দৃষ্টিতে পুরস্কার ও শাস্ড়ির নৈতিক দাবি এ আযাবগুলোর মাধ্যমে কিছুটা অবশ্যই পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখনো এ দাবির বিরাট অংশ অপূর্ণ রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যে আযাব এসেছে তা কেবলমাত্র সে সময় দুনিয়ার বুকে যে প্রজন্ম বর্তমান ছিলো তাদেরকেই পাকড়াও করেছে। কিন্তু যে প্রজন্ম অসৎ কাজের বীজ বপন করে যুল্‌ম-নির্যাতন ও অসৎ কাজের ফসল তৈরি করে তা কাটার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলো এবং যাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হলো পরবর্তী প্রজন্মকে তারা যেন প্রতিশোধের আইনের কার্যকারিতা থেকে পরিষ্কার গা বাঁচিয়ে চলে গেছে। যারা ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশ্ব- জাহানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিয়ম বুঝবে, তারা অবশ্যই এ কথা সাক্ষ্য দেবে যে, ইনসাফ ও বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনের যে নৈতিক চাহিদাগুলো এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে সেগুলো পূর্ণ করার জন্যে এই ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আবার একটি দ্বিতীয় বিশ্বের জন্ম দেবে এবং সেখানে দুনিয়ার সমস্ড় যালেমকে তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে। আর সে বদলা হবে দুনিয়ার এ আযাব থেকে অনেক বেশি কঠিন ও কঠোর।

আল কুর'আনে অনেক ঐতিহাসিক সূত্রের উলে- খ রয়েছে। কুর'আনের ঐ সূত্রগুলোকে সামনে নিয়ে ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। মানব ইতিহাসের অনেক আদি রহস্য এর মাধ্যমে উদঘাটন করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস এবং মানব সমাজের ক্রমবিবর্তন ধারার ইতিহাস পবিত্র কুর'আনে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। এ বিষয়ের ওপরে গবেষণা করলে পৃথিবীতে মানব জাতির সূচনা এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক রহস্যই উদঘাটিত হবে।

এথিসিসে ঐতিহাসিক নিদর্শগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিছু নিদর্শন কল্যাণের ও কিছু নিদর্শন ধ্বংসের বলে উলে- খিত হয়েছে যা ইতোপূর্বে কোনো গবেষণাই দেখা যায়নি।

কুর'আনে উলে- খিত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর আলোচনার ভিত্তিতে একথা পরিষ্কার করা হয়েছে যে, সেই আদিকাল থেকে মানবজাতির মধ্যে দুটি ধারা চলে এসেছে। একটি হলো স্রষ্টার আনুগত ধারা। আর অন্যটি হলো স্রষ্টার অবাধ্য ধারা। এ দুটি ধারার বিশে- ষণের মাধ্যমে সর্বকালেই মানুষ নিজেদের জন্যে সঠিক ধারা বেছে নিতে পারে।

কুর'আন গবেষণার ফলে মানবজাতির সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ড় মানবজাতির মূল ধারার মধ্যে বিশ্বাসের এক মহা ঐক্য পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। আর সেটা হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের ঐক্য। বিশ্বাসের এই ঐক্যের ভিত্তিতে মানব সমাজ সর্বকালেই নিজেদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে এবং অর্জন করতে পারে চিরন্ড়ন সাফল্য।

গ্রন্থপঞ্জী

০১. *আল কুর’আনুল কারীম*

০২. আবুল ফিদা হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্ন কাসীর (র.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, অনুবাদঃ ড. মুহাম্মদ মুজীবর রহমান (ঢাকা: হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, দ্বাদশ মুদ্রণ-২০১২)

০৩. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), *তাফসীরে মাআরেফুল কুর’আন*, অনুবাদঃ মাওলানা মহিউদ্দীন খান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- নভেম্বর ১৯৮৮)

০৪. সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী (র.), *তাফহীমুল কুর’আন*, অনুবাদঃ আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল- ডিসেম্বর ২০০৪)

০৫. সাইয়েদ কুতুব (র.), *তাফসীর ফী যিলালিল কুর’আন*, অনুবাদঃ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ (ঢাকা: আল কুর’আন একাডেমী, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৫)

০৬. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.), *তাফসীরে ওসমানী*, অনুবাদঃ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ (ঢাকা: আল কুর’আন একাডেমী, প্রকাশকাল- জানুয়ারি ১৯৯৬)

০৭. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.), *তাফসীরে মাযহারি*, অনুবাদঃ মাওলানা তালেব আলী (নারায়ণগঞ্জ: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯)

০৮. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *আল কুর’আন সহজ বাংলা অনুবাদ* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৩)

০৯. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন বারদিযবাহ্ আল-বুখারী (র.), *সহীহ আল-বুখারী*, অনুবাদঃ হুসাইন ইব্ন সোহ্রাব (ঢাকা: হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-২০১১)

১০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (র.), *সহীহ মুসলিম*, অনুবাদঃ আ.স.ম. নূরুজ্জামান (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল- জানুয়ারি ২০১১)

১১. মুহিউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (র.), *রিয়াদুস সালিহীন*, অনুবাদঃ হুসাইন ইব্ন সোহ্রাব (ঢাকা: হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ-২০১১)

১২. শায়খুল হাদীস আল-ামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (র.), *আর রাহীকুল মাখতুম* অনুবাদঃ খাদিজা আখতার নিয়ায়ী (ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, চতুর্থ প্রকাশ- ২০১৩)

১৩. ডা. জাকির নায়েক, *লেকচার সমগ্র* (ঢাকাঃ সত্যকথা প্রকাশ, প্রকাশকাল-২০১১)

১৪. আবুল ফিদা হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (র.), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* অনুবাদঃ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দিন, মাওলানা বোরহান উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন, মাওলানা মোঃ আবু তাহের (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ-২০১৩)

১৫. ড. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কুর'আন ও বিজ্ঞান,* অনুবাদঃ ওসমান গনি (ঢাকাঃ প্রীতি প্রকাশনী, প্রকাশকাল-১৯৯৪)

১৬. প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক ও ডা. সারওয়াত জাবীন, *কুর'আন- হাদিসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার* (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ- অক্টোবর ২০০৫)

১৭. মাওলানা হিফযুর রহমান, *কাসাসুল কুর'আন (১ম খন্ড),* অনুবাদঃ মাওলানা নুর‍ুর রহমান (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরি, প্রকাশকাল- আগস্ট ১৯৯০)

১৮. আল‍ামা আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া বালাযুরী (র.), *ফুতহুল বুলদান,* অনুবাদঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- মার্চ ১৯৮৮)

১৯. মুহাম্মদ আসাদ, *মক্কার পথ,* অনুবাদঃ শাহেদ আলী (ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, প্রকাশকাল-১৯৯৪)

২০. এ.এন.এম সিরাজুল ইসলাম, *মক্কা শরীফের ইতিকথা* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ১৯৮৯)

২১. আবদুস শহীদ নাসিম, *আল কুর'আন কি ও কেন?* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ কুর'আন শিক্ষা সোসাইটি, প্রকাশকাল- আগস্ট ২০১০)

২২. আবদুস শহীদ নাসিম, *নবীদের সংগ্রামী জীবন* (ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, প্রকাশকাল- ডিসেম্বর ২০১২)

২৩. আমীন আহসান এসলাহী, *কুর'আন গবেষণার মূলনীতি,* অনুবাদঃ সৈয়দ মোহাম্মদ জহীর‍ুল হক (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৮০)

২৪. ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা* (ঢাকা: অন্যন্যা প্রকাশনী, প্রকাশকাল- মার্চ ২০০১)

২৫. ড. মরিস বুকাইলি, ড. কিথ এল. মূর, গ্যারি মিলার, *আল কুরআন এক মহাবিস্ময়,* অনুবাদ: খন্দকার রোকনুজ্জামান (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল- নভেম্বর ২০০৮)

২৬. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯১)

২৭. ইব্রাহিম খাঁ, *ইতিহাস সোপান* (ঢাকা: রশিদীয়া লাইব্রেরী, প্রকাশকাল-১৯৫৫)

২৮. ইকবাল কবীর মোহন, *আমার কুর'আনের বন্ধুরা* (ঢাকা: শিশুকানন, প্রকাশকাল- অক্টোবর ২০১০)

২৯. *বাংলা পিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল- মার্চ ২০০৩)

৩০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮)

৩১. *ইসলামি বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল- জুন ১৯৯৭)

৩২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *মুসলিমদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?,* অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-২০১২)

৩৩. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী* (রাজশাহী: হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-২০১০)

৩৪. ইবনে হিশাম (র.), *সীরাতুন্নবী (সা.)* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল- ডিসেম্বর ১৯৯৪)

৩৫. আল্লাম মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী, *আপনাদের প্রশ্নের জবাব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল- জুলাই ২০০৩)

৩৬. খাঁন মোসলেহ উদ্দীন আহমদ, *মহানবী (সা.) সীরাত কোষ* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল- সেপ্টেম্বর ২০০১)

৩৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *সীরাতে সরওয়ারে আলম,* অনুবাদ: আব্বাস আলী খান (ঢাকা: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, প্রকাশকাল ১৯৮৮)

৩৮. খন্দকার নাজনিন সুলতানা, *হযরত লূত (আ.) ও মর‍ু সাগর* (ঢাকা: সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, প্রকাশকাল- ০৮ এপ্রিল, ২০০৯)

৩৯. মৃত সাগর, উইকিপিডিয়া, দ্যা ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া

৪০. সাইয়েদ কুতুব, *আল-কুর'আনের শৈল্পিক সৌন্দর্য*, অনুবাদ: মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন (ঢাকা: খায়র‍ুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল- জুন ২০০৮)

৪১. ফিলিপ কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিকথা*, অনুবাদ: অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (ঢাকা: বুক ভিলা প্রকাশকাল- জানুয়ারী ১৯৫৯)

৪২. কাজী মুহাম্মদ নিজামুল হক, *বিশ্বময় ইসলামের পুনর্জাগরণ* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৪)

৪৩. মো: রফিকুল ইসলাম, মাওলানা শফিকুল ইসলাম খান, হাফেজ মাওলানা আরিফ হোসাইন মজুমদার, *বিষয়ভিত্তিক কুর'আন ও হাদীস সংকলন-১* (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল- জানুয়ারি ২০১১)

৪৪. আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামে জ্ঞানচর্চা* (ঢাকা: সেন্টার ফর এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১৪)

৪৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খন্ড* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, প্রকাশকাল- ফেব্র‍ুয়ারি ২০১৪)

৪৬. আবদুস শহীদ নাসিম, *মুক্তির পথ ইসলাম* (ঢাকা: WAMY প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০০৪)

৪৭. আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস, *মহিলাদের হজ্জ ও উমরা*, অনুবাদ: আবদুস শহীদ নাসিম (ঢাকা: বর্ণালি বুক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০১৫)

৪৮. সাজেদা হোমায়রা, *শ্রেষ্ঠ জীবনের পথ* (ঢাকা: বাংলাদেশ কুর'আন শিক্ষা সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১৪)

৪৯. অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *আল কুর'আনে উদাহরণ* (রাজশাহী: আল ইসলাহ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০০৮)

৫০. আবদুস শহীদ নাসিম, *কুর'আনের সাথে পথ চলা* (ঢাকা: বর্ণালি বুক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৬)

৫১. হযরত শাহ ওয়ালী উল-াহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র.), *হুজ্জাতুহিল বালেগা*, অনুবাদ: আহমদ মানযুর ল মাওলা (ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৭৮)

৫২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *কুর'আন ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৯৭)

৫৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (গবেষণা বিভাগ), *ইসলামী দর্শন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৪)

৫৪. আলহাজ্জ অধ্যাপক গোলাম ছোবহান, *কুর'আন মজিদের উৎকর্ষের কিছু দিক* (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, প্রকাশকাল- মার্চ ১৯৯৭)

৫৫. হাফেজ মাওলানা শহীদুল ইসলাম, *আল কুর'আনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত* (ঢাকা: আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৬)

৫৬. মো: নুর ল ইসলাম, *আল-কুর'আনে আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৩)

৫৭. আবুল হোসাইন মাহমুদ, *আল-কুর'আনের কাহিনী* (ঢাকা: আর.আই.এস পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল- নভেম্বর ১৯৯৬)

৫৮. খন্দকার আবুল খায়ের, *দারসুল কুর'আন* (১ম খন্ড) (ঢাকা: জামেয়া প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৮৩)

৫৯. এ.এ. বশীর আহমাদ, *কুর'আন সুন্নাহ চয়নিকা* (ঢাকা: প্রত্যয় প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৯৬)

৬০. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান, *কুর'আনের পরিভাষা* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, প্রকাশকাল- ডিসেম্বর ১৯৯৮)

৬১. হযরত শাহ ওয়ালী উল-াহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র.), হুজ্জাতুল-াহিল বালেগা, অনুবাদ: আহমদ মানযুর ল মাওলা (ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৭৮)

৬২. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্ড়ন দ্বন্দ্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৯১)

৬৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

৬৪. ইসলামি গবেষণা পত্রিকা- *মাসিক পৃথিবী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)

৬৫. ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মাদানী, *বিশ্ব মানচিত্র হাদীস শরীফের বিস্ময়* (ঢাকা: মর্ডান পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৯)

৬৬. S.M. Ismail, *The Quran and the Contemporary Challenges* (New Delhi: Commonwealth Publisers)

৬৭. Mazheruddin Siddiqi, *The Qur'anic Concept of History* (Delhi: Adam Publishers and ditributors, First edition- 1994)

৬৮. Dixiel Brown, *Rethinking tradition in modern Islamic thought* (New York: Cambridge University press, First edition- 1996)

৬৯. Richard P. Mitchell, *The Society of the Muslim brothers* (New York: Oxford University press, First edition- 1993)

৭০. Harold Ingram, *Arabia and the Isles,* (London: 1946)

৭১. R.H.Kirnan, *The Unveiling of Arabia* (London: 1937)

৭২. Phiby, *The Empty Quarter* (London: 1933)

❖❖❖